KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : 20/২ 20/৩ 20/৪	Year of Publication : শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬৫ কার্তিক - পৌষ ১৩৬৫ মাঘ - চৈত্র ১৩৬৫
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

চতুরঙ্গ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

হুমায়ুন কবির
সম্পাদিত
ত্রৈমাসিক পত্রিকা
কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৫

পরিবারের সকলের পক্ষেই ভালো

জীবাণুনাশক নিমতেল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের প্রচুর নরম ফেনা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ত্বকের সবরকম মালিন্য দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও প্রফুল্ল থাকবেন।

মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

CMC-12 BEN.

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মওলানা আজাদের কাহিনী ২০১

আনন্দ বাগচী ॥ সহজিয়া ২১৬

রাম বসু ॥ অন্ধকার যাদুকরী ২১৭

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ॥ গাছের ছায়াটা দুলছে ২১৮

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন ॥ অপেক্ষা করো ২১৯

অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : মধ্যযুগ ২২১

আলবেয়ার কামু ॥ অচেনা ২৪২

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ২৪৬

নরেশ গুহ ॥ আধুনিক সাহিত্য ২৬৭

সমালোচনা—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী,
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ২৭৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

দুরন্ত গতিকে

ব্যাহত করবেন না

ইস্পাত, সিমেণ্ট, কয়লা—
সমুদ্ধতর ভারত গঠনে যা' কিছু
সহায়ক, তার সব কিছুই অধিকতর
পরিমাণে বহন করতে
গিয়ে সময়কেও হার মানাতে
চাইছি আমরা। এই মহৎ
প্রচেষ্টার অংশীদার হিসাবে
আপনার দানও যথেষ্ট। রেলের
চাকার দুরন্ত গতিকে কেউ যদি
ব্যাহত করতে চায়, আপনি
সহ্য করবেন কখনও?
আমাদের এই গুরু দায়িত্বের
সুষ্ঠু সম্পাদনে আপনার
সহযোগিতা উৎসারিত হোক।
আপনার সাহায্যপ্রার্থী আমরা।

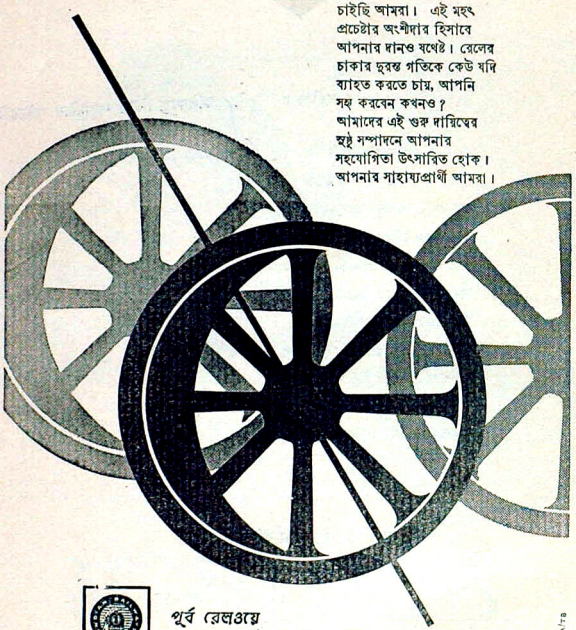

পূর্ব রেলওয়ে

মওলানা আজাদের কাহিনী

[মওলানা আজাদের ইচ্ছা ছিল যে তিন খণ্ডে তিনি নিজের জীবনী সম্পূর্ণ করবেন। প্রায় দুই বছর আগে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়, এবং তিনি আত্মকথা বলতে শুরু করেন। তিনি উর্দুতে বলে যেতেন, এবং তাঁর কথনের ভিত্তিতে ইংরিজিতে বইখানির রচনা শুরু হয়। দ্বিতীয় খণ্ড তিনি সম্পূর্ণ দেখে এবং অনুমোদন করে যেতে পেরেছিলেন, এবং স্বতন্ত্রভাবে তার প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি প্রথমে কিছুই বলতে চাননি, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড আত্মকথার খসড়া তৈরী হবার পরে প্রথম খণ্ডে ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতেও রাজী হন। প্রথম খণ্ডের জন্য একটি সংক্ষিপ্তসারও তৈরী করা হয়, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে তাকে প্রকাশ করার কথা ঠিক হয়। সেই সংক্ষিপ্তসারের বাঙলা অনুবাদ "চতুরঙ্গে" পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় বইখানির আর একটী অধ্যায় প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডের কাজ আর সমাপ্ত হ'ল না, তৃতীয় খণ্ডের রচনাও শুরু সম্ভব হয়নি।—**হুমায়ুন কবির**]

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে বিকাশ, তা দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম দেশ একেবারে বদলে গেছে, নতুন ভারতবর্ষ জন্মলাভ করেছে। সরকারি চাকুরে এবং জনসাধারণ সকলের মনেই স্বাধীনতা লাভের সেদিন এক নতুন আগ্রহ। ব্রিটিশ সরকারেরও মতি গতির পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম থেকেই আমার ভরসা ছিল যে শ্রমিক মন্ত্রীসভা ভারতীয় সমস্যা সমাধানের ঠিক রাস্তা খুঁজে নেবেন। ক্ষমতা হাতে আসবার অল্পদিন পরেই মন্ত্রীসভা ভারতবর্ষে এক পার্লামেণ্টারী দল পাঠান। ১৯৪৫-৪৬ সালের শীতকালে সে দল ভারতবর্ষ সফর করেন। দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সে সম্বন্ধে তাঁরা পুরোপুরিভাবে সজাগ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ যে বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না সে কথাও তাঁরা বুঝেছিলেন। তাঁদের রিপোর্ট পেয়ে শ্রমিক মন্ত্রীসভার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল যে বন্ধু মনোভাব নিয়ে অবিলম্বে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।

১৯৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত সাড়ে নটার সময় রেডিও মারফৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নতুন সিদ্ধান্ত শুনলাম। পার্লামেণ্টে লর্ড পেথিক লরেন্স ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন পাঠান হবে। মন্ত্রীসভার সদস্যরা ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবেন। সেই তারিখেই বড়লাট যে বক্তৃতা করেন তাতেও এ সিদ্ধান্তের উল্লেখ ছিল। ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য

সচিব স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস এবং নৌবাহিনীর সচিব মিঃ আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে ক্যাবিনেট মিশন গঠিত হল। রেডিও ঘোষণার আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রতিনিধি এসে ক্যাবিনেট মিশন সম্বন্ধে আমার মত জানতে চাইলেন।

আমি তাঁকে বললাম যে শ্রমিক সরকার যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন তাতে আমি খুসী হয়েছি। ক্যাবিনেট মিশনে স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস আসবেন এটাও আনন্দের কথা। স্যার স্টাফোর্ড আমাদের পুরাতন বন্ধু এবং আমাদের সঙ্গে আগেও ভারতবর্ষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমি আরো বললাম যে একটা কথা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। নতুন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যাকে এড়াবার চেষ্টা না করে সাহসের সঙ্গে তার সমাধান করবার জন্য চেষ্টা করছেন—এটা খুব বড় কথা।

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ এটলী পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করেন, ইংগ-ভারতীয় ইতিহাসে তার বোধ হয় কোন নজীর নেই। তিনি খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করলেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে, তাই নতুন দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে। পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে চাইলে সমস্যা সমাধানের বদলে অচল অবস্থারই সৃষ্টি হবে। তাঁর এ ঘোষণা ভারতবাসীর মনে গভীর ছাপ ফেলে।

মিঃ এটলী বক্তৃতায় যে সব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি স্বীকার করলেন যে ইংগ-ভারতীয় সমস্যা সমাধানের এ পর্যন্ত যে চেষ্টা হয়েছে, তাতে দু'পক্ষেরই ভুলচুক হয়েছে। তাঁর মতে অতীত কথার পুনরাবৃত্তি না করে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই উচিত। তিনি একথাও বললেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরোনো ধরনের সমাধান চলবে না। ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের যে মনোভাব ১৯২০, ১৯৩০ এমন কি ১৯৪২ সালের ভারতবর্ষের সঙ্গেও তার তুলনা চলে না। তিনি একথাও পরিষ্কারভাবে বললেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে যে মতভেদ, তার উপর বেশী জোর তিনি দিতে চান না। যত মতভেদ বা বিভাগই থাকুক না কেন, স্বাধীনতার দাবীতে সমস্ত ভারতবাসীই একমত। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠা রাজনৈতিক কর্মী বা সরকারি চাকুরে নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীরই সম্মিলিত দাবী যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে। অকুণ্ঠভাবে মিঃ এটলী একথাও স্বীকার করলেন যে জাতীয়তাবোধ দিন দিন প্রবল হয়ে এখন সৈন্যবাহিনীকেও অভিভূত করেছে। যুদ্ধের সময় যে সব সৈন্য বিপুল বিক্রমে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে লড়াই করেছে, তারাও আজ স্বাধীনতার প্রত্যাশী। মিঃ এটলী বললেন যে ভারতবর্ষে অনেক রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুস্কিল রয়েছে কিন্তু কেবলমাত্র ভারতবাসীরাই সে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। পরিশেষে তিনি ঘোষণা করলেন যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব এবং এখনই তা করতে হবে এই বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত নিয়েই ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে আসছেন।

ক্যাবিনেট মিশন ২৩এ মার্চ ভারতবর্ষে পৌঁছলেন। পূর্বে একবার স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস যখন এদেশে আসেন তিনি কলকাতায় শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্তের অতিথি হয়েছিলেন। যোগেশবাবু তখন বাঙলার কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান। তিনি আমাকে বললেন যে ক্রীপসের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাচ্ছেন। ক্রীপসকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে আমি তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিলাম।

১৯৪৬ সালের দোসরা এপ্রিল আমি দিল্লি পৌঁছলাম। সকল কথা বিবেচনা করে আমার মনে হল যে এবারকার আলোচনায় ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক সম্বন্ধের প্রশ্ন সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়—এবারকার সমস্যা ভারতীয় সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সমাধান। সিমলা কনফারেন্সে আলোচনার গতি দেখে আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে রাজনৈতিক সমস্যা এখন সমাধানের স্তরে এসে পৌঁচেছে, কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ এখনও নিরসন হয়নি। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে খুবই ভাবিত হয়ে উঠেছিল, একথা কোনো বিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবেন না। কয়েকটি প্রদেশে অবশ্য তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ কাজেই প্রাদেশিক ব্যাপারে সে সমস্ত অঞ্চলে তাদের বিশেষ কোনো ভয় ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষে তারা কিন্তু সংখ্যা লঘিষ্ঠ এবং তাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে স্বাধীন ভারতবর্ষে তারা হয়তো উপযুক্ত স্থান বা পরিপূর্ণ সুযোগ পাবে না।

দীর্ঘদিন ধরে অবিশ্রান্তভাবে এ সমস্যা নিয়ে ভাবছিলাম। সমস্ত পৃথিবীতেই এ যুগে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করবার আন্দোলন চলছে। ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের নৈসর্গিক পরিস্থিতি, জনসাধারণের আচার বিশ্বাস ও ভাষায় এতো পার্থক্য যে আপাতদৃষ্টিতেই বোঝা যায় যে এদেশে এককেন্দ্রিক সরকার চলবে না। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করলে তার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়দের আশঙ্কারও অনেকখানি নিরসন হবে, একথাও আমার মনে হল। তাই আমি শেষে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতেই ভারতীয় সংবিধান রচনা করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রদেশগুলিকে যতদূর সম্ভব স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু জাতীয় ঐক্য রক্ষার ব্যবস্থাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তব্যের বণ্টন সুষ্ঠুভাবে করতে পারলে এ সমস্যার সমাধান মিলবে। কতগুলি ক্ষমতা ও কর্তব্য নিঃসন্দেহভাবে কেন্দ্রীয়, কতকগুলি তেমনি নিঃসন্দেহভাবে প্রাদেশিক, কিন্তু এমন অনেক ক্ষমতা ও কর্তব্য রয়েছে যেগুলি প্রাদেশিক সরকারকেও দেওয়া চলে অথবা প্রাদেশিক সরকারগুলি রাজী হলে কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের দায়িত্ব নিতে পারে। অনিবার্যভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে এমন ক্ষমতা এবং কর্তব্যের ন্যূনতম ফর্দ তৈরী করা সংবিধান রচনার প্রথম কাজ মনে হল। প্রাদেশিক সরকারের সম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ভার নিতে পারে এমন ক্ষমতা ও কর্তব্যের একটা দ্বিতীয় ফর্দ তৈরীও সেই সঙ্গেই করতে হবে। দ্বিতীয় লিস্টটিকে অপশনাল বা মর্জি-মাফিক লিস্ট বলা চলবে। যদি কোনো প্রাদেশিক সরকার চায়, তবে এ লিস্টের সমস্ত বা কোনো বিশেষ ক্ষমতা বা কর্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সোপর্দ করে দিতে পারবে।

দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও চলাচল—সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন এ তিনটি বিষয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা হতে পারে না। তারা তাই নিঃসন্দেহভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকায় পড়ে। প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসব বিষয়ের পরিচালনা করবার চেষ্টা করলে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বুনিয়াদ ভেঙে পড়বে। কতকগুলি বিষয় ঠিক তেমনি প্রথম দৃষ্টিতেই প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হবে, কিন্তু এ দুধরনের বিষয় বাদ দিলে অন্য বহু বিষয়ের খোঁজ মিলবে যেগুলি খুশীমত কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। আমার মনে হল যে এ ধরনের বিষয়গুলি কি ভাবে পরিচালিত হবে সে সিদ্ধান্ত করবার এক্তিয়ার প্রাদেশিক আইন-সভাকে দেওয়া উচিত।

এ বিষয়ে যতই ভাবতে লাগলাম, ততই বুঝতে পারলাম যে অন্য কোন উপায়ে ভারতীয়

সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। এই নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে যদি ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়, তাহলে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও চলাচল এই তিনটি বিভাগ ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্যান্য সমস্ত বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের আয়ত্ত্বাধীন থাকবে। যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ, সেখানে প্রাদেশিক সরকার এ সমস্ত বিভাগ পরিচালনা করলে হিন্দু প্রভুত্বের যে আশঙ্কা মুসলমানের রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা দূর হয়ে যাবে। একবার এ আতঙ্ক দূর হয়ে গেলে প্রদেশগুলি বুঝতে পারবে যে কোন কোন বিষয় বা বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সোপর্দ করলে কাজের সুবিধা এবং তখন তারা স্বেচ্ছায়ই তা করবে। এ কথাও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল যে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিলেও ভারতবর্ষের মতন দেশের রাজনৈতিক সমস্যার যথার্থ সমাধান এই পথেই মিলবে। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, তার জনসংখ্যা বিপুল। বিভিন্ন প্রদেশে সম ভাষাভাষী যে জনতার বাস, তাদের আচার ব্যবহার বিশ্বাসেও ঐক্যের পরিচয় মেলে। রাজনৈতিক আদর্শ এবং শাসনকার্যের সুবিধার কথা বিচার করলেও প্রদেশগুলিকে তাই যতদূর সম্ভব স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যত রাজনীতির এ ছক বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে আমার মনে গড়ে উঠছিল। ক্যাবিনেট মিশন যখন ভারতবর্ষে, পৌঁছলেন, তদ্দিনে এ সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। স্থির করলাম যে উপযুক্ত সময়ে আমার এ পরিকল্পনা পরিষ্কার-ভাবে ব্যক্ত করতে হবে।

১৯৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য মিশন কয়েকটি প্রশ্ন তৈরী করে রেখেছিলেন, ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ছিল তাদের মধ্যে প্রথম। মিশন যখন এ বিষয়ে আমার মত জানতে চাইলেন তখন যে সমাধানের উল্লেখ করেছি, তার আভাস দিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার আবশ্যকভাবে ন্যূনতম কতকগুলি বিষয় পরিচালনা করবে এবং কতকগুলি বিষয় প্রাদেশিক সরকারের মর্জি-মাফিক কেন্দ্রীয় সরকারকে সোপর্দ করা যেতে পারে এ কথা বলামাত্রই লর্ড পেথিক লরেন্স আমাকে বললেন, "আপনার কথায় ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার এক নতুন সমাধানের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।"

আমার বক্তব্যের প্রতি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস বিশেষ আগ্রহ দেখালেন এবং বহুক্ষণ ধরে আমাকে জেরা করতে লাগলেন। মনে হল যে আমার এ সমাধান তাঁরও পছন্দ হয়েছে।

১২ই এপ্রিল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আমার যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল তা সবাইকে বললাম। সাম্প্রদায়িক সমস্যার যে সমাধান আমার মনে এসেছিল, বিশদভাবে সদস্যদের কাছে তার বিবরণ দিলাম। গান্ধীজী এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যেরা এই প্রথম আমার পরিকল্পনার কথা শুনলেন। প্রথমে কমিটি এ পরিকল্পনাকে বিশেষ আমল দেননি। সদস্যেরা নানা ধরনের আপত্তি ও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁদের সন্দেহ দূর করে আপত্তিগুলি আমি এক এক করে খণ্ডন করলাম। অবশেষে কমিটি মানলেন যে আমার পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য। গান্ধীজী বললেন যে তিনি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

গান্ধীজী আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে এ কথাও বললেন যে, যে কঠিন সমস্যার সমাধান এতদিন পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি, আমি তার সমাধানের পথ নির্দেশ করেছি। আমার সমাধানে মুশলিম লীগের চরম সাম্প্রদায়িক সদস্যেরও আশঙ্কা দূর হবে, অথচ সে সমাধান

কোনো সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচিত হয়নি, সমগ্র জাতির স্বার্থের তা অনুকূল। গান্ধীজী জোর দিয়ে বললেন যে ভারতবর্ষের মতন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা না করলে চলবে না। সে হিসাবেও আমার সমাধান প্রশংসনীয়। তিনি বললেন যে আমি কোনো নতুন নীতির প্রবর্তন করিনি বটে, কিন্তু ভারতীয় পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে কার্যকরী হতে পারে আমার সমাধানে তা স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তব্য কেবলমাত্র তিনটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা সর্দার প্যাটেল আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক দফতর ও মুদ্রাসংক্রান্ত বিষয় আবশ্যিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের শিল্প বাণিজ্যের বিকাশও কেবলমাত্র সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই সম্ভব এবং সেজন্য দেশের বাণিজ্যিক নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা দরকার।

তাঁর এ সমস্ত আপত্তির উত্তর আমাকে দিতে হল না। আমি কিছু বলবার আগেই গান্ধীজী নিজে আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সর্দার প্যাটেলের আপত্তির খণ্ডন করলেন। তিনি বললেন যে মুদ্রা বা শুল্কের ব্যাপারে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মতভেদ হবে একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। এ সমস্ত ব্যাপারে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য একই নীতি অবলম্বন করা সকলের স্বার্থেরই অনুকূল। তাই মুদ্রা অথবা শুল্ক বিষয়ক দফতরগুলিকে আবশ্যিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সোপর্দ করবার কোনো প্রয়োজন নেই।

লাহোরে মুশলিম লীগ যে প্রস্তাব পাশ করে, তাতেই প্রথম ভারত বিভাগের সম্ভাবনার কথা উঠেছিল। এই প্রস্তাবটিকেই পরে পাকিস্তান প্রস্তাব নাম দেওয়া হয়। আমি যে সমাধান পেশ করলাম মুশলিম লীগের আশঙ্কা দূর করা ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আমার প্রস্তাব আলোচনার পরে আমার মনে হল যে সমস্ত দেশের সামনে এ সমাধান পেশ করবার সময় এসেছে। ১৯৪৬ সালের ১৫ই এপ্রিল মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবীর বিশ্লেষণ করে আমি সংবাদপত্রে তাই এক বিবৃতি দিলাম। তারপরে দশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ আজ দ্বিধা-বিভক্ত কিন্তু সেই বিবৃতি আবার পড়ে দেখলাম যে আমি সেদিন যে কথা বলেছিলাম, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে।

ভারতীয় সমস্যার সমাধান কিভাবে হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমার পরিণত চিন্তার ফল এ বিবৃতিতে প্রকাশ করেছিলাম। সেদিন আমি যা বলেছিলাম এবং আজও যা বলতে চাই, তার পরিচয় মিলবে বলে এখানে তার পূর্ণ উদ্ধৃতি করা প্রয়োজন :

"মুসলীম লীগ পাকিস্তানের যে পরিকল্পনা তৈরি করেছে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি তার বিচার করেছি। সমগ্র ভারতবর্ষের ভবিষ্যত তার ফলে কি ভাবে প্রভাবিত হবে, ভারতবাসী হিসাবে আমি সে কথা ভেবে দেখেছি। ভারতীয় মুসলমানের মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভেবে মুসলমান হিসাবেও আমি সে পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করেছি।

পরিকল্পনাটির সমস্ত দিক বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে তা ভারতবর্ষের সকলের জন্যই ক্ষতিকারক এবং বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে তা মারাত্মক। বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে সমস্যা সমাধানের বদলে বরং আরো নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে।

একথা বলতে আমার সংকোচ নেই যে পাকিস্তান নামটিতেই আমার আপত্তি

রয়েছে। নাম শুনলে মনে হতে পারে যে পৃথিবীর কোন কোন অংশ পাক বা পবিত্র, অর্থাৎ অন্যান্য অংশ না-পাক বা অপবিত্র। পৃথিবীকে এভাবে পবিত্র ও অপবিত্র অঞ্চলে ভাগ করা আমার মতে ইসলামের নীতি-বিরোধী—এরকম পরিকল্পনার অর্থ ইসলামকে অস্বীকার। ইসলাম এ ধরনের বিভাগ মানে না। হজরত মহম্মদ বলেছেন যে খোদা সমস্ত পৃথিবীকেই আমার জন্য মসজিদ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

একথাও আমার মনে হয় যে পাকিস্তানের পরিকল্পনায় পরাজিত মনোবৃত্তির প্রকাশ। ইহুদীরা যে ভাবে জাতীয় আবাসভূমির দাবী করেছে, তারই উদাহরণে পাকিস্তান পরিকল্পনার জন্ম। পাকিস্তান চাওয়ার অর্থ এই যে ভারতীয় মুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষে নিজেদের ন্যায্য স্থান অধিকার করতে পারবে না বলে বিশেষভাবে সংরক্ষিত এক অঞ্চলে আশ্রয় খুঁজতে চায়।

ইহুদীরা যে নিজেদের জন্য এক বিশেষ আবাসভূমি খুঁজছে, তার অর্থ বোঝা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহুদীরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এমন কোন দেশ বা অঞ্চল নেই যেখানে ইহুদীরা শাসন ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে নিজেদের দাবী পূরণ করতে পারে। ভারতীয় মুসলমানদের কথা একেবারে আলাদা। তাদের সংখ্যা প্রায় নয় কোটি। সংখ্যায় এবং চরিত্রগুণে তারা ভারতীয় জীবনে যে স্থান অধিকার করে রয়েছে, তার ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শাসনের সমস্ত প্রশ্নেই তাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কয়েকটি অঞ্চলে সংখ্যাধিক্যের ফলে তাদের পক্ষে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা আরো সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ রকম পরিবেশে পাকিস্তান দাবী করা একেবারে নিরর্থক। সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ণয়ে বর্তমানে আমার যে অধিকার, মুসলমান হিসাবে সে অধিকারের এক কণা ছাড়তেও আমি এক মুহূর্তের জন্য রাজী নই। সমগ্র দেশে আমার যে জন্মগত অধিকার তা ছেড়ে দিয়ে কেবল দেশের খণ্ড বিশেষ নিয়ে তুষ্ট থাকার কল্পনা আমার মতে কাপুরুষতার লক্ষণ।

সকলেই জানে যে দুই জাতির ভিত্তিতে মিঃ জিন্না পাকিস্তানের খসড়া তৈরি করেছেন। তাঁর বিশ্বাস যে ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যের ফলে ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। সে সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে দুটিই প্রধান। হিন্দু এবং মুসলমান তাঁর মতে বিভিন্ন জাতি বলে তাদের রাষ্ট্রও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। ডঃ এডওয়ার্ড টমসন যখন মিঃ জিন্নাকে বলেন যে ভারতবর্ষের হাজার হাজার গ্রামে জনপদে শহরে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করে, তাদের কিভাবে দুই জাতি মনে করা চলে, তখন উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন যে তাতে কিছু এসে যায় না। জিন্না সাহেবের মতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে, জনপদে শহরে দুই জাতি বাস করে, তাই তাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে।

সমস্যার অন্য সমস্ত দিক ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র মুসলমান স্বার্থের দিক থেকেও আমি পাকিস্তানের বিচার করে দেখেছি। শুধু তাই নয়, যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের বিন্দুমাত্র উপকার হবে, তাহলে আমি নিজে পাকিস্তান পরিকল্পনা স্বীকার করে তার প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এ প্রতিশ্রুতি দিতেও আমার দ্বিধা

নেই। আসল অবস্থা অন্যরকম। কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ দিয়ে প্রশ্নটির বিচার করলেও অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানের কোনই লাভ হবে না, তাদের যুক্তিসংগত আশঙ্কারও কোন আশ্বাস তাতে মিলবে না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে নিরাবেগ চিত্তে তার বিচার করা যাক। ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করে তখন দুটি রাষ্ট্রের পত্তন হবে, তার একটিতে হিন্দুর অন্যটিতে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হবে। হিন্দুস্তান রাষ্ট্রে প্রায় সাড়ে তিন কোটি চার কোটি মুসলমান রয়ে যাবে, কিন্তু তারা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে বলে কোন প্রদেশেই তাদের আর গুরুত্ব থাকবে না। উত্তর প্রদেশে শতকরা সতেরো জন, বিহারে শতকরা বারো জন এবং মাদ্রাজে শতকরা নয় জন মুসলমানের অবস্থা তখন এ সমস্ত হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশে আজকার তুলনায় আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। এসব অঞ্চলে মুসলমানেরা প্রায় হাজার বছর বাস করেছে, নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহু প্রসিদ্ধ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তারা দেখবে যে রাতারাতি তারা নিজেদের জন্মভূমিতে পরদেশীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং আর্থিক বিচারে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছনে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে সেই অবস্থায় যদি অবিমিশ্র হিন্দু রাজত্বে তাদের বাস করতে হয়, তবে তাদের বর্তমান অবস্থার যে আরো অবনতি হবে একথা সহজেই বোঝা যায়।

ভারত বিভাগের পরে হিন্দু-ভারতে এই তো মুসলমানের ভবিষ্যত। পাকিস্তানেও তাদের ভাগ্য অনিশ্চিত হতে বাধ্য, কারণ হিন্দুস্তানে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, পাকিস্তানের মুসলমান কখনোই সেভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হতে পারবে না। বস্তুতপক্ষে পাকিস্তানে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হলেও অমুসলমানের সংখ্যাও নেহাৎ কম হবে না। অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষায় অমুসলমান অনেক উন্নত, তাই সংখ্যায় মুসলমানের সামান্য আধিক্য হলেও পাকিস্তানের অমুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায় মুসলমানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবে। শুধু তাই নয়। পাকিস্তানে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা গরিষ্ঠতা যত বেশীই হোক না কেন, পাকিস্তান স্থাপনার দ্বারা ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের আসল সমস্যার সমাধান হবে না।

দুটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্বে পরস্পরের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার কোন সমাধান হবে না। বরং তার ফলে এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে অন্য রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের জন্য দায়ী করবার প্রবৃত্তি দেখা দেবে। পাকিস্তানের হিন্দুকে যদি হিন্দুস্তানের হিন্দুর কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়, তবে হিন্দুস্তানের মুসলমানকে পাকিস্তানের মুসলমানের কাজের জন্য ঠিক সেইভাবেই জবাবদিহি করতে হবে। ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে জামিন হিসাবে বিবেচনা করা বা অন্য রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাজের বদলা নেওয়ার মনোবৃত্তি গড়ে উঠে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বেষ মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ দেখা দিতে বাধ্য। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় তাই ভারতীয় মুসলমানের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। যে সব অঞ্চলে তারা

সংখ্যালঘিষ্ঠ, পাকিস্তান স্থাপনের ফলে সে সমস্ত এলাকায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থার কোনো উন্নতি হবে না। যে সব অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও তাদের প্রভাব ও মর্যাদা সম্মিলিত ভারতবর্ষের নাগরিকের তুলনায় কম হতে বাধ্য। নিখিল ভারতবর্ষ নিয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, তবে তার নাগরিকের যে মর্যাদা বা পৃথিবীর রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ণয়ে যে প্রভাব, পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে সে মর্যাদা বা প্রভাব তাদের কখনোই হবে না।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যদি ভারতীয় মুসলমানের এত বেশী স্বার্থবিরোধী, তবে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ পাকিস্তানের মোহে এমন আচ্ছন্ন হয়েছে কেন? হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িক দলের পরিচয় মেলে তাদের আচরণের বিশ্লেষণ করলেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে। মুসলীম লীগ যখন প্রথম পাকিস্তানের উল্লেখ করে তখন এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক হিন্দুদল প্রবলভাবে তার বিরোধিতা করে, বলে যে পাকিস্তান পরিকল্পনার ফলে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় বহির্ভারতের মুসলমানের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক বিরাট ইসলামিক রাষ্ট্রের পত্তন করবে। এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক দলের বিরোধিতার ফলে মুসলীম লীগের সমর্থকদের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। তারা সোজাসুজি বলতে শুরু করল যে হিন্দুরা যখন পাকিস্তানের এত বিরোধী তখন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের নিশ্চয়ই লাভ হবে। এমন এক উত্তেজনার আবহাওয়া সৃষ্টি হল যে তার ফলে এ ধরনের যুক্তির গলদ কারু চোখে ধরা পড়ল না। ধীর স্থির-ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় পাকিস্তানের সুবিধা অসুবিধা বিচারের আর অবকাশ রইল না। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় পাকিস্তানের নামে মেতে উঠল। বর্তমানের উত্তেজনা যেদিন প্রশমিত হবে এবং পাকিস্তানের প্রশ্ন নিয়ে যুক্তি-নির্ভর আলাপ আলোচনা শুরু হবে, সেদিন পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সমর্থকেরাও যে মুসলমান সমাজের জন্যে ক্ষতিকারক বলে পাকিস্তান পরিকল্পনা বর্জন করবে এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমার প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস যে ফরমুলা স্বীকার করে নিয়েছে তাতে পাকিস্তান পরিকল্পনার গলদ ও ত্রুটিগুলি এড়িয়ে তার সমস্ত সুবিধাই ভারতীয় মুসলমানদের মিলবে। কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যের ফলে মুসলমান প্রধান অঞ্চলেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃত্ব করবে এই আশঙ্কার বশেই পাকিস্তান পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রদেশগুলিকে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সমস্ত উদ্বৃত্ত ক্ষমতা সোপর্দ করে কংগ্রেস এ আশঙ্কা দূর করবার ব্যবস্থা করেছে। কংগ্রেসী সিদ্ধান্ত অনুসারে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি দুই ভাগে ভাগ করা হবে। তার মধ্যে একটি লিস্টে কয়েকটিমাত্র বিষয় বাধ্যতা-মূলকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত। কিন্তু বাকী অধিকাংশ বিষয়ই প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছা নির্ভর বলে যদি কোনো প্রদেশ চায়, তবে একমাত্র তিনটি বিষয় ভিন্ন বাকী সমস্ত বিষয় নিজের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালনা করতে পারবে। কংগ্রেসী পরিকল্পনার ফলে মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি ইচ্ছামত

নিজেদের শাসন ও বিকাশের ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সর্বভারতীয় প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের উপরও তাদের প্রভাব বজায় থাকবে।

ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি তাতে এদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত শক্তি সোপর্দ করে এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। ভারতবর্ষকে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করবার চেষ্টাও সমান অবাস্তব। সমস্যার সমস্ত দিক বিচার করে অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছি যে কংগ্রেসের ফরমুলা ভিন্ন এ সমস্যার অন্য কোনো সমাধান নেই—কংগ্রেস যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক প্রদেশের বিকাশের সম্ভাবনা অব্যাহত। মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির যে সমস্ত আশঙ্কা দূর করবার জন্য পাকিস্তান পরিকল্পনার উদ্ভব, কংগ্রেসের সমাধানে সে সমস্ত আশঙ্কা নিরসন হবে। পাকিস্তানের সব চেয়ে বড় গলদ যে তার ফলে মুসলমানেরা যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ, সেখানে তারা অবিমিশ্র হিন্দুরাজের অধীন হয়ে পড়বে, এ সমাধানে সে সম্ভাবনাও দূর হয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতবিরোধ ও মনোমালিন্য, আমার বিশ্বাস যে তা কেবলমাত্র সাময়িক। মন প্রাণ দিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ণয় করবে, তখন এ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিরোধ দূর হয়ে যাবে। গ্লাডস্টোন বলতেন যে যদি কেউ জল দেখে ভয় পায়, তবে জলে ফেলে দিলেই তার সে ভয় কাটবে। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষেও ঠিক তাই হবে—ভারতবর্ষ যেদিন দায়িত্ব গ্রহণ করে নিজের শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে নেবে, সেদিন বর্তমানের ভয় এবং সন্দেহও মিটে যাবে।

স্বাধীনতা অর্জনের পরে ভারতবর্ষ সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কলহ ভুলে গিয়ে বর্তমান জগতের বিভিন্ন সমস্যা বর্তমান কালের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে শিখবে। তখনও মতবিরোধ ও পার্থক্যের অবকাশ থাকবে, কিন্তু সে সমস্ত মতভেদের ভিত্তি সাম্প্রদায়িক না হয়ে অর্থনৈতিক হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক-দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মতবিরোধ বজায় থাকবে, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে না হয়ে সে সমস্ত রাজনৈতিক দল রাজনীতি ও অর্থনীতির ভিত্তিতে গঠিত হবে। ভবিষ্যতে সম্প্রদায়ের বদলে শ্রেণীভেদের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলাদলি বজায় থাকবে এবং প্রত্যেক দলের কর্মসূচীও সেই অনুসারে গঠিত হবে। যদি কেউ বলেন যে এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতে ঘটনার পরিণতি আমার এ বিশ্বাসকে ব্যর্থ করতে পারে, তাহলেও আমি বলব যে ভারতবর্ষের নয় কোটি মুসলমান এমন শক্তিশালী সম্প্রদায় যে কেউ কোনো মতেই তাদের অবহেলা করতে পারবে না। ভবিষ্যতের গর্ভে যাই নিহিত থাক না কেন, তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

লাহোর প্রস্তাবে লীগ ভারত বিভাগের যে পরিকল্পনা প্রথম পেশ করে এতদিনে লীগের দাবী তার চেয়ে অনেক বেশী উগ্র হয়ে উঠেছিল। লীগ যে ঠিক কি চায় সে কথা কিন্তু কখনোই পরিষ্কার করে বলেনি। লাহোর প্রস্তাবের কথাগুলি ভাসাভাসা এবং

বিভিন্ন ভাবে তার অর্থ করা চলে, কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না—মুসলীম লীগের মতে মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলির পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন পাওয়া উচিত। স্যার সিকান্দার হায়াত খাঁ যখন প্রস্তাবটির সমর্থন করেন তখন তিনি এই অর্থেই করেছিলেন, কিন্তু লীগের নেতারা এখন তাঁদের দাবী অনেক বেশি ফাঁপিয়ে তুললেন। তাঁদের সাম্প্রতিক বক্তব্য হল যে মুসলমান প্রধান এলাকাগুলি আলাদা করে এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থাপনা করতে হবে। ক্যাবিনেট মিশন কিন্তু লীগের এ দাবী মানতে প্রস্তুত হলেন না, বরং আমি যে ধরনের সমাধানের কথা বলেছিলাম, তাই তাঁদের বেশি পছন্দ হল।

এপ্রিলের প্রায় শেষ পর্যন্ত আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। ক্যাবিনেট মিশন আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, নিজেরাও প্রায়ই ঘরোয়া বৈঠকও করছিলেন। মিশন মাঝে কয়েকদিনের জন্য বৈঠক মুলতবী রেখে কাশ্মীর বেড়াতে গেলেন। ততদিনে গ্রীষ্ম এসে পড়েছে, দিল্লির গরম দিনদিন অসহ্য হয়ে উঠছিল। আমিও কয়েকদিনের জন্য একটু বিশ্রাম চাইছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম যে কাশ্মীর গিয়ে থাকব এবং সেখানকার বন্ধুদের এ বিষয়ে লিখেওছিলাম। যখন শুনলাম যে মিশনও কাশ্মীর যাচ্ছেন, তখন স্থির করলাম যে আমার সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি কাশ্মীর গেলে লোকে হয়তো ভাববে যে মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের মতামত প্রভাবান্বিত করবার উদ্দেশ্যেই আমি সেখানে যাচ্ছি। কাশ্মীরের বদলে তাই মুসৌরী যাওয়া স্থির করলাম।

ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হবার পরে শ্রীরাজাগোপালাচারী লীগের দাবী কংগ্রেসের মানা উচিত বলে যে প্রচারণা শুরু করেছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করেছি। রাজাজী একথাও বলেছিলেন যে ভারত বিভাগের দাবী নীতি হিসাবে মেনে নেওয়া উচিত। তার ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয় এবং প্রায় সমস্ত কংগ্রেস কর্মীর তিনি বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। গান্ধীজিও রাজাজীর এ সমস্ত কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হন এবং স্থির করেন যে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আমাদের আলাপ আলোচনার সময় তাঁর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি রাজাজীকে তাই মাদ্রাজে থাকতে বললেন। রাজাজী মনে খুব দুঃখ পেলেও কিছুদিন চুপ করে রইলেন, কিন্তু আমি যখন মুসৌরী গেলাম তখন আমার কাছে অনুযোগ করে পত্র দিলেন। আমি গান্ধীজির নির্দেশের কথা জানতাম না, রাজাজীর চিঠি পড়ে প্রথম বুঝলাম যে গান্ধীজিই রাজাজীকে দিল্লি আসতে বারণ করেছেন। আমার মনে হল যে এখনো গান্ধীজির মত বদলায়নি, তাই তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করেই রাজাজীকে লিখলাম যে যদি তিনি চান দিল্লি আসতে পারেন। আমার চিঠি পেয়েই রাজাজী এসে হাজির হলেন। গান্ধীজি প্রথমে রাজাজীর উপরেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে বললাম যে আমার চিঠি পেয়েই তবে রাজাজী দিল্লি এসেছেন। গান্ধীজিকে একথাও আমি বললাম যে আমার মতে এভাবে রাজাজীকে দিল্লি আসতে বারণ করা উচিত নয়।

২৪শে এপ্রিল ক্যাবিনেট মিশন দিল্লি ফিরে এসে বড়লাটের সহযোগিতায় রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার একটা হিসাবনিকাশ শুরু করলেন। দুয়েক দিন বৈঠক হবার পরে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস একদিন এসে আমার সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্তা বললেন। ২৭শে এপ্রিল মিশন ঘোষণা করলেন যে প্রধান দুটি দলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ও সমঝোতার জন্য আরো আলাপ আলোচনা প্রয়োজন। মিশন তাই কংগ্রেস এবং লীগের সভাপতিদের বললেন যে মিশনের সঙ্গে সিমলায় আরো আলাপ আলোচনার জন্য দুটি প্রতিষ্ঠানেরই

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হোক। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার আমার উপর ছেড়ে দিল। আমি জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেলকে আমার সহকর্মী হিসাবে বেছে নিলাম। গভর্ণমেণ্ট সিমলায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা সব ঠিক করে দিল। গান্ধীজি এই সমিতির সভ্য না হলেও আলাপ আলোচনার বিভিন্ন স্তরে তাঁর পরামর্শ প্রয়োজন হবে বলে মিশন তাঁকেও সিমলা আসবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি মিশনের আমন্ত্রণ স্বীকার করে সিমলা এসে 'ম্যানর ভিলা'য় রইলেন। গান্ধীজির সুবিধা হবে বলে আমরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও 'ম্যানর ভিলা'তেই করব স্থির করলাম।

২রা মে সিমলায় আলাপ আলোচনা শুরু হয়ে ১২ই মে পর্যন্ত জারী রইল। জাবদা বৈঠক ছাড়াও আমাদের অনেক ঘরোয়া আলোচনা হত। আমি 'রিট্রীট' বলে বাড়িটিতে ছিলাম। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যেরা কয়েকবার সেখানে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। আমিও দরকার মত মিশনের সভ্য বা সভ্যদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। এসব আলোচনায় কখনো আসফ আলী এবং কখনো হুমায়ুন কবির আমার সঙ্গে থাকতেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমরা দিল্লি ফিরে এলাম। মিশনের তরফ থেকে কি প্রস্তাব করবেন তা নিয়ে সদস্যেরা তখনো নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিলেন। অবশেষে ১৬ই মে তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে মিঃ অ্যাটলী মিশনের সুপারিশগুলি পেশ করলেন। সেই দিনই মিশনের পরিকল্পনার বিবরণ দিয়ে সরকারী পুস্তিকা প্রকাশ করে বলা হয় যে মিশনের মতে এই পরিকল্পনাই ভারতের নতুন সংবিধান রচনার শ্রেষ্ঠ উপায়।

ক্যাবিনেট মিশন যে পরিকল্পনা পেশ করলেন, তা নিয়ে আলাপ আলোচনা সিমলাতেই হোক এই ছিল আমার মত। লর্ড ওয়াভেলকে আমি বললাম যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে হবে, তার জন্য যে ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে সব কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন গ্রীষ্মকালের দিল্লির প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে তা সম্ভব হবে না। লর্ড ওয়াভেল বললেন যে দিল্লি ভারতের রাজধানী এবং সমস্ত সরকারী কাজের কেন্দ্রস্থল। তাই তিনি যদি বেশীদিন দিল্লির বাইরে থাকেন, তবে তাতে সরকারী কাজের ব্যাঘাত হবে। আমি মন্তব্য করলাম যে তিনি লাটভবনের বাইরে কখনো আসেন না এবং লাটভবন তাপনিয়ামক যন্ত্রের সাহায্যে সর্বদাই নাতিশীতোষ্ণ, কাজেই দিল্লিতে থাকলে তাঁর কোনই অসুবিধা হবে না, কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যদের এবং আমাদের পক্ষে দিল্লির গ্রীষ্ম প্রায় অসহ্য, সেই নিদারুণ উত্তাপের মধ্যে ধীর স্থিরভাবে কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। উত্তরে লর্ড ওয়াভেল বললেন যে মামলা কয়েকদিনেই শেষ হয়ে যাবে, কাজেই আমাদের বিশেষ কষ্ট হবে না।

বস্তুতপক্ষে কিন্তু মে মাসের বাকী দিন এবং সমস্ত জুন মাস আমাদের দিল্লিতে কাটাতে হল। সে বছর গরমও পড়েছিল অস্বাভাবিক। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যেরা সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। লর্ড পেথিক লরেন্সের কষ্ট হয়েছিল সব চেয়ে বেশী—একদিন তিনি দারুণ গ্রীষ্মে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আমার জন্য লর্ড ওয়াভেল একটি ঘরে তাপনিয়ামক যন্ত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তার ফলে খানিকটা আরামও পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন দিল্লির আবহাওয়া এত অসহ্য যে আলাপ আলোচনা কোনো রকমে শেষ করবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে যে মতভেদ তার কোনো সমাধান কিন্তু সহজে হল না। আলাপ আলোচনার ফলেও আমরা বোঝাপড়ার কোন রাস্তা খুঁজে পেলাম না।

ক্যাবিনেট মিশন এবং তার পরিকল্পনা নিয়ে যে আলোচনা, তাই আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল, কিন্তু কাশ্মীরের ঘটনার ফলে আমাদের মুস্কিল আরো বেড়ে গেল। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে জাতীয় সম্মেলন বা ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরের জনসাধারণের রাজনৈতিক দাবীর জন্য লড়ছিল। মিশন ভারতবর্ষে পৌঁছলে শেখ আবদুল্লার মনে হল যে এই সুযোগে কাশ্মীরের জনসাধারণের অধিকারও আদায় করা যাক। মিশনের কাছে তিনি দাবী করলেন যে মহারাজার স্বেচ্ছাশাসন শেষ করে জনসাধারণের স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে কাশ্মীরের রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালাতে হবে। শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতার করে কাশ্মীর সরকার এ দাবী অগ্রাহ্য করতে চাইল। কিছুদিন আগে জাতীয় সম্মেলনের একজন প্রতিনিধিকে মন্ত্রীসভায় নেওয়া হয়েছিল, তখন ভেবেছিলাম যে জাতীয় সম্মেলন এবং কাশ্মীর সরকারের মধ্যে মিটমাট করা সম্ভব হবে। শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে বোঝাপড়ার আশা মিটে গেল।

কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের যে দাবী, বরাবর জওহরলাল তার সমর্থন করেছেন। তাঁর মনে হল যে এ নতুন পরিস্থিতিতে তাঁর কাশ্মীর যাওয়া উচিত। জাতীয় সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিলের পরামর্শও দরকার হয়ে উঠল। আমি আসফ আলীকে বললাম যে তিনি যেন এসব আইনঘটিত ব্যাপারের ভার নেন। জওহরলাল বললেন যে তিনিও আসফ আলীর সঙ্গে কাশ্মীর যাবেন। মহারাজার সরকার এসব কার্যকলাপে বিচলিত হয়ে পড়ল এবং হুকুম জারী করল যে জওহরলাল বা আসফ আলী কাশ্মীর প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁরা যখন রাওয়ালপিণ্ডী থেকে রওয়ানা হয়ে উরী পৌঁছলেন, তখন তাঁদের প্রবেশ রোধ করা হল। তাঁরা কাশ্মীর সরকারের এ আদেশ মানতে অস্বীকার করলেন। কাশ্মীর সরকার তাঁদের গ্রেফতার করল। ফলে সমস্ত ভারতবর্ষে এক তুমুল আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

এ সমস্ত ঘটনায় আমি বিশেষ সুখী হতে পারিনি। কাশ্মীর সরকারের ব্যবহারে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হল যে কাশ্মীর নিয়ে নতুন সংঘর্ষ সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বড়লাটকে জানালাম যে টেলিফোনে জওহরলালের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। উরীর ডাকবাংলোয় তাঁকে নজর বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কাজেই টেলিফোনে যোগাযোগ করতে খানিকটা সময় লাগল। আমি জওহরলালকে বললাম যে যত শীঘ্র সম্ভব, তাঁর দিল্লি ফিরে আসা উচিত এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীর প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে জোর দেওয়া ঠিক হবে না। এ কথাও বললাম যে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আমি নিজেই কাশ্মীর সমস্যার বিষয় মনোযোগ দেব। শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর সহকর্মীদের মুক্তির জন্যও আমি চেষ্টা করব, কিন্তু জওহরলালের অবিলম্বে কাশ্মীর থেকে দিল্লি ফিরে আসা উচিত।

জওহরলাল প্রথমে খানিকটা আপত্তি করলেন কিন্তু আমি যখন জোর দিয়ে বললাম যে কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানে আমি নিজেই মনোযোগ দেব, তখন তিনি ফিরে আসতে রাজী হলেন। আমি লর্ড ওয়াভেলকে বললাম যে জওহরলাল এবং আসফ আলীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য এরোপ্লেন পাঠালে ভালো হয়। আমি সন্ধ্যা আন্দাজ সাতটার সময় লর্ড ওয়াভেলকে এ অনুরোধ করি। তিনি সেই রাত্রিতেই এরোপ্লেন পাঠিয়ে দেন। রাত্রি দশটায় এরোপ্লেন শ্রীনগর পৌঁছে এবং ভোর দুটোর সময় জওহরলাল এবং আসফ আলীকে নিয়ে দিল্লি ফিরে আসে। এ ঘটনায় লর্ড ওয়াভেল যে ভাবে মিত্রতার সঙ্গে আমাদের সমস্ত

কথা শোনেন, আমার মনে তা এক গভীর প্রভাব ফেলে।

আগেই বলেছি যে ১৬ই মে তারিখে ক্যাবিনেট মিশন তাঁদের পরিকল্পনা প্রকাশিত করেন। আমি ১৫ই এপ্রিল আমার বিবরণে যে সমাধান পেশ করেছিলাম, ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্ত মূলত তারই ভিত্তিতে রচিত। আমার বিবরণে আমি যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায়ও কেবলমাত্র সেই তিনটি বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সোপর্দ করা হয়েছিল। বিষয়গুলি হল—দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও চলাচল। মিশন একটি নতুন জিনিস যোগ করেছিলেন। সমগ্র দেশকে মিশন তিনটি অঞ্চলে ভাগ করলেন। মিশনের মনে হল যে এরকম বিভাগের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আশঙ্কার আরো লাঘব হবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান নিয়ে 'খ' অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব হয়, সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাধিক্য হত। বাঙলাদেশ ও আসাম নিয়ে যে 'গ' অঞ্চল গঠনের কথা হয়, সেখানেও মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মিশন ভাবলেন যে এ ব্যবস্থার ফলে সর্বভারতে সংখ্যালঘু হলেও মুসলমানের আশঙ্কার কোনো কারণ থাকবে না—লীগ যে সব দাবী তুলেছিল, তারও সুরাহা হবে।

মিশন আমার এ মতও মেনে নিয়েছিলেন যে বেশীর ভাগ বিষয়গুলিই প্রাদেশিক সরকারের হাতে সোপর্দ করা উচিত। মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলির তাতে প্রায় সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন মিলবে। যে তিনটি আঞ্চলিক বিভাগের প্রস্তাব মিশন করেছিলেন, প্রাদেশিক সরকারের সম্মতি ভিন্ন কোনো বিষয়ে সে সব আঞ্চলিক বিভাগের কোনো এক্তেয়ার থাকবে না একথাও মিশন বলেছিলেন। 'খ' এবং 'গ' বিভাগে সংখ্যাধিক্য হওয়ায় এ দুই বিভাগেও মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন ভাবনার কারণ থাকবে না এবং তাদের যা ন্যায্য দাবী তা পূরণ করতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তেয়ারে মাত্র তিনটি বিষয় থাকবে, এবং সে বিষয়গুলি এমন যে তাদের বিকেন্দ্রিত করা চলে না। আমি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম তার সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার মিল প্রায় ষোল আনা। দুই প্রস্তাবের মধ্যে একমাত্র তফাৎ তিনটি আঞ্চলিক বিভাগের সৃষ্টি, কিন্তু এই সামান্য পার্থক্যের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অস্বীকার করা উচিত হবে না এই ছিল আমার মত।

মিঃ জিন্না তো প্রথমে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে সরাসরি অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন। স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবীর উপর লীগ এত বেশি জোর দিয়েছিল যে এখন সম্মিলিত ভারতীয় রাষ্ট্র স্বীকার করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। মিশন কিন্তু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা কিছুতেই দেশ বিভাগ করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাবের সমর্থন করবেন না। লর্ড পেথিক লরেন্স এবং স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস বারবার বলতে লাগলেন যে মুসলীম লীগের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্র যে কি ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, অথবা প্রতিষ্ঠা করলেও স্থায়ীভাবে টিকতে পারে তা তাঁদের বোধের অগম্য। তাঁরা দুজনেই বললেন যে আমি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম, সেই অনুযায়ী কেবল তিনটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে বাকী সমস্ত বিষয় প্রাদেশিক সরকারকে সোপর্দ করা হবে, এভাবে ছাড়া ভারতীয় সমস্যার আর কোনো সমাধান সম্ভব নয়।

লর্ড পেথিক লরেন্স একাধিকবার বললেন যে আমার পরিকল্পনা যদি গৃহীত হয়, তবে প্রথম প্রথম মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি তিনটি বিষয় বাদে বাকী সমস্ত বিষয়গুলিই নিজেরা পরিচালনা করবে। এভাবে তারা সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী হবে। হিন্দু-

প্রধান প্রদেশগুলি স্বেচ্ছায় আরো কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেবে। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের মতে বিভিন্ন প্রদেশের এ রকম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বনে আপত্তির কোনো কারণ নেই। যদি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হয়, তবে যে সমস্ত প্রাদেশিক রাষ্ট্রের সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার থাকা স্বাভাবিক। তার ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষমতা ও বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে নিজেদের ইচ্ছা মত সোপর্দ করবে।

তিন দিন ধরে বৈঠক চলবার পরে অবশেষে মুসলীম লীগ কাউন্সিল এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল। তৃতীয় দিনে মিঃ জিন্নাকেও মানতে হল যে ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সমস্যার যে সমাধান প্রস্তাব করেছেন, তার চেয়ে ভাল সমাধান সম্ভব নয়। তিনি এ কথাও স্বীকার করলেন যে আর বেশী কিছু পাওয়া যাবে না। মিশন যে সব সুবিধা ও রক্ষাকবচের কথা বলেছেন, তার চেয়ে বেশী প্রত্যাশা করা ভুল হবে। তিনি তাই কাউন্সিলকে মিশনের প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে অনুরোধ করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে কাউন্সিল তাঁর কথা স্বীকার করে নিল।

আমি তখনো মুসৌরিতে রয়েছি এমন সময় মুসলীম লীগের কয়েকজন সদস্য এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা ঘটনার এ পরিণতি দেখে একেবারে অবাক ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরিষ্কারভাবেই তাঁরা বললেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব যদি লীগ মেনে নিতে পারে, তবে মিছামিছি স্বতন্ত্র স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা বলে মুসলমান সমাজকে এতদিন বিভ্রান্ত করেছে কেন? আমি বিশদভাবে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলাম। অবশেষে তাঁরা মানলেন যে মুসলীম লীগ যাই বলুক না কেন, ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব করেছেন তার চেয়ে সুবিধার কোনো প্রস্তাব ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে আশা করি উচিত হবে না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যখন আলোচনা শুরু হল, তখন আমি বললাম যে আমরা নিজেরা যে খসড়া তৈরী করেছি, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে তারই সমর্থন রয়েছে। কাজেই আমাদের পক্ষে মিশনের মূল প্রস্তাব স্বীকার করে নেওয়ার কোনো বাধা হল না। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ কি হবে, সে বিষয়ে মিশনকে আমি বলেছিলাম যে এ-ব্যাপার ভারতবর্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস ছিল যে এভাবেই এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। এ কথাও বলেছিলাম যে ভারতবর্ষের হাতে এ প্রশ্ন ছেড়ে দিলে ভারতবর্ষ হয়তো স্বেচ্ছায়ই কমনওয়েলথের অংশীদার হয়ে থাকতে চাইবে। স্যার স্টাফোর্ড আমাকে বলেছিলেন যে তাই হবে। মিশনের প্রস্তাবে তাই এ সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে আমাদের পক্ষে মিশনের প্রস্তাব মেনে নেওয়া আরো খানিকটা সহজ হল। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পরে ওয়ার্কিং কমিটি ২৬শে জুন তারিখে যে প্রস্তাব গ্রহণ করল, তাতে ভবিষ্যত ভারতের নক্সার ব্যাপারে ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিল, কিন্তু সাময়িকভাবে যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব মিশন করেছিলেন, তা মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

মিশন যে ভাবে আলাপ আলোচনা চালিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁদের অভিনন্দন জানানো প্রয়োজন মনে করি। স্যার স্টাফোর্ড আমাদের পুরাতন বন্ধু, তাঁর বিষয়ে আমার মতামত আগেই ব্যক্ত করেছি। লর্ড পেথিক লরেন্স বা মিঃ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আমার পূর্বে কোনোদিন সাক্ষাত হয়নি, কিন্তু দুজনের ব্যবহারেই আমি সন্তুষ্ট হই। বিশেষ করে

লর্ড পেথিক লরেন্স যে সহানুভূতি এবং বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের বিচার করেছিলেন, তা আমাকে মুগ্ধ করে। বয়সে প্রবীণ হলেও তার মনে যৌবনের উদ্যম ও উৎসাহ ফুটে উঠত। আন্তরিকতা, ভারতবর্ষের জন্য প্রীতি এবং তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির সমাবেশের ফলে তাঁর প্রত্যেক কথাই আমাদের গভীরভাবে বিবেচনা করতে হয়েছে। মিঃ আলেকজাণ্ডার বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু যখনই কোনো কথা বলেছেন তখনই তাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচার শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ উভয় পক্ষই যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে এটা একটি গৌরবময় কীর্তি। হিংসা ও দ্বন্দ্বের বদলে আলাপ আলোচনা ও মিত্রতার পথে ভারতবর্ষের মুক্তি সমস্যার সমাধান মানব ইতিহাসে আশার বাণী নিয়ে আসল। একথাও মনে হল যে সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের মলিন কাহিনী চিরদিনের জন্য অবসান হল। সমস্ত দেশে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল—জাতিধর্ম দল নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতার দাবীতে একাগ্র হয়ে মেতে উঠল। আমাদের মন সেদিন আনন্দে ভরপুর, আমরা তখন বুঝতে পারিনি যে সে আনন্দ টিকবে না, অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁর হতাশা ও দুঃখে সমস্ত দেশ আবার ছেয়ে যাবে।

সহজিয়া

আনন্দ বাগচী

সমস্তটাই আমার শরীর এই যে কাঁপে থিরথিরিয়ে জল,
এই যে কাঁপে চোখের পাতা, লুব্ধ ঠোঁটে ছায়া,
বুকের কাছে টাল খাওয়া রোদ্দুরে
শঙ্খনী মন ফণার নিচে ঘুমোয়,
সমস্তটাই আমার শরীর, আমার।

কাঁচের মধ্যে কতক্ষণ বা বাঁচে আমার শরীর
এ যে প্রথম কদম ফুলের মত
আয়না ভরে ফুটে উঠলো, অস্ফুট আঘ্রাণে।
আঁশপাঠের শাড়ি রইল পড়ে আমার
হল না সই
নিজের চোখে চোখ রেখে চুল বাঁধা।
বেলা গেল এমনি করে বয়ে।
ঝাপ্‌সা শব্দে জল পড়ে কলঘরে।

আমার বুকে কখন দিল ঢেউ জানি না, চোখ পড়েছে আজ
থমকে গেছে সমস্ত যৌবন
নগ্নবাহু বাউল জঙ্ঘায়
নানা রেখায় পড়েছে আজ বেলাশেষের রোদ,
কাঁচের মধ্যে কতক্ষণ বা বাঁচে আমার শরীর
আমি এখন ইস্কাপনের বিবি॥

অন্ধকার যাদুকরী

রাম বসু

তোমার দেহের দোরে মৃত্যু হোক, মুক্তি হোক, নারী
আমাকে বিচূর্ণ করে লুপ্ত করো তোমার সত্তায়
বশীভূত উপাদানে, যেন দিব্য আত্মার প্রভায়
ঋষিকণ্ঠে বলতে পারি : আমি শুধু তোমারি, তোমারি।

মাতাও, মাতাও তুমি উন্মাদক নাভিকুণ্ডলের
রোমাঞ্চ কস্তুরী গন্ধে, দাঁতে কাটো বিদ্যুতের হার
উন্মুখ জিভের ডগা গোলাপের মত সুষমার
মুখের হীরক দীপ্তি রহস্যের দূর মণ্ডলের।

রক্তের আদিম স্পর্ধা ফুঁসে ওঠে মৃদু হাসো যদি
ফোটায় পদ্মের কুঁড়ি করপুটে বৈশাখী নিঃশ্বাস
রঙের ঘূর্ণির মুখে নির্যাসের নীরব উচ্ছ্বাস
পায়ে মাথা কুটে হয় নিরবধি সময়ের নদী।

বিচ্ছিন্ন হিমার্ত আমি, যন্ত্রণায় তোমার আরতি
গর্ভের মতন স্থির, হিংস্র যেন বর্ষার তরাই
তোমার পাথুরে পায় মুখ রেখে আমি মরে যাই
অন্ধকার যাদুকরী, তুমি হও আমার নিয়তি।

গাছের ছায়াটা দুলছে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

গাছের ছায়াটা দুলছে এইদিকে, অন্যদিকে আলো;
এইমাত্র মৃত এক ধূসর পল্লব গেলো উড়ে,
যেন, কোনো স্বপ্ন, যার বয়স বেড়েছে, কিন্তু মন
নিতান্ত সবুজ নীল হলুদে মেশানো চিত্রপট,
যার স্থিতি নেই, স্মৃতি আছে।
আলোর তরঙ্গে আছে অনেক সংবাদ :
যে যেমন ভাবে তার প্রতীক-আশ্রয়ী এ-উদ্যানে
কয়েকটা ফল, কিছু ফুল, আর কিছু নিষ্ফলতা
একই সঙ্গে পাশাপাশি সম্মিলিত আজ।
কোথাও ফেনিল ঝর্ণা, চিত্রার্পিত দূরের পাহাড়,
সন্নিকটে হে সমুদ্র, হৃদয়ের মতো তুমি আছো।
তোমার বুকের ধ্বনি, তোমার চোখের জলধারা
আমাদের ধমনীতে বহে আজো, সে কি তুমি জানো!

গাছের ছায়াটা দুলছে এদিকে, অন্যদিকে আলো;
আমি কোন্ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াবো!
দূরে থেকে যে-দৃশ্যকে তৃষ্ণার পানীয় ব'লে জানি,
নিকটে সে-ই তো এক কৃত্রিম কানন,
আমার এবং আরো কতো মানুষের কতো মুখ
জলের উপরে প্রতিবিম্ব হয়ে এখানে জ্বলছে।
চোখ দিয়ে চেনা যায়—এরকম স্মৃতি,
মনে মনে বলা যায়—এরকম নাম, কোনো নাম
আজো কি ফোটেনি কোনো বিবেকের নিজের বাগানে!

গাছের ছায়াটা দুলছে এইদিকে; দীর্ঘ, নগ্ন ছায়া।

অপেক্ষা করো

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

আমার সমস্ত যৌবনের রঙ্ নিয়ে
কৃষ্ণচূড়ার তেপান্তর—
এখানে সময়-কে মাথায় চেপে
শুয়ে আছে একটা অন্ধকার রাক্ষসী!
সূর্য এখনো ফেরেনি,
কেবল আমার আশৈশব স্বপ্ন—
এক ঝাঁক জোনাকি
তার বুকের উপর দুঃস্বপ্ন দেখছে!

এখানে এসো না,
তোমার দিনগুলি হারিয়ে যাবে।

সেই যে আমার ভবিষ্যতের পৃথিবী,
যা' নদীর মতো কখনো কখনো
তোমারই চোখের জলে ফুলে ওঠে, পাড় ভাঙে,
আবার হাসতে হাসতে অন্যদিক গ'ড়ে তুলে
রাতের চাঁদটাকে বুকে নিয়ে দাঁড়ায়—
তোমারই অভিমান ভাঙবার জন্য,
সেখানে
আরো কিছুকাল অপেক্ষা করো তুমি।
তোমার কচি কচি দিনগুলি
বাতাসে হেলান দিয়ে ভেসে ভেসে,
নেচে নেচে মানুষ হোক ততদিনে।

এখানে একটা নিশ্চল পাহাড়ের মতো
ঘুমিয়ে, পড়ে আছে রাক্ষসীটা।
কবরের গভীর পেটের মতো
ওর কুৎসিত রঙ্
সবদিক ছেয়ে ফেলেছে,
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার ঝাড়!
আমার এক ঝাঁক জোনাকি
তিল তিল ক'রে জ্বলে
ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লাঠির মাথায় হাত রেখে
কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়েছি আমি।
সূর্য এখনো ফেরেনি,
এবার গলা ছেড়ে একটা ডাক দেবো।
কারণ তার হাতেই
রাক্ষসীটার প্রাণভোমরা ধরা পড়েছে।

তুমি অপেক্ষা করো।
তোমার মুখের মতোই সুন্দর একটি সকাল,
স্বর্গ যার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে,
অনেকগুলি পাখির সঙ্গে কথা বলতে বলতে
তোমাকেই আনতে যাবে।
সেদিন আসতে আসতে
পেছনে চোখ ফেরালেই দেখবে :
তোমার দামাল দিনগুলিকে
ঢেউয়ের ফেনায় নাচাতে নাচাতে
নদীর মতো অনুসরণ করছে তোমাকেই
আমার সেই ভবিষ্যতের পৃথিবী;

মুখে তার গান,
হাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ॥

নৈরাজ্যবাদ : মধ্যযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

৪। খ্রীষ্টান জগত : ঈশ্বরের রাজ্য

রোমান স্টোইকদের হাতে নৈরাজ্যবাদের রূপান্তর হল। খ্রীষ্টপূর্ব আদর্শবাদীরা বাস করতেন স্বপ্নের নন্দনকাননে, যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টানরা আশ্রয় নিলেন বিশ্বাসের দুর্গে। লাওৎসে থেকে জেনো পর্যন্ত প্রাচীনরা ছিলেন সহজিয়া, রূপনগরের অধিবাসী, নিরঞ্জন দেবতার উপাসক। যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর উত্তরসাধকরা হলেন তপশ্চারী, ধর্মরাজ্যের নাগরিক, পরমপিতা ঈশ্বরের পূজারী। দুই যুগের সন্ধিকার রোমান স্টোইক সেনেকা।

সেনেকা ও যীশুখ্রীষ্ট জন্মেছেন প্রায় একই সময়ে। তাঁদের জীবনে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু জীবনদর্শনে কিছু মিল ছিল যার দাম দিয়েছিলেন তাঁরা জীবন দিয়ে। যীশুখ্রীষ্টের মতো সেনেকার মৃত্যুও এক অবিস্মরণীয় মর্মান্তিক কাহিনী। কর্সিকায় নিঃসঙ্গ নির্বাসনকালে সেনেকা যখন আটটি বৎসর কাটিয়েছিলেন একটির পর একটি ট্র্যাজেডী রচনা করে, তখন তিনি ভাবতে পারেননি যে তাঁর নিজের ট্রাজেডীর কাছে ওগুলো তুচ্ছ হয়ে যাবে।

বালক নিরোর মা সম্রাট ক্লডিয়াসের দ্বিতীয় পত্নী এগ্রিপিনা স্বপ্ন দেখছেন তাঁর পুত্র হবে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। তাকে গড়ে তুলবার জন্যে চাই একজন এরিস্টটল্। তিনি সেনেকাকে নিয়ে এলেন নির্বাসন থেকে। রোমে এসে দার্শনিক পাঁচ বছর রইলেন ভাবী সম্রাটের শিক্ষক হয়ে, তারপর পাঁচ বছর সম্রাটের মন্ত্রী ও রাষ্ট্রচালক রূপে। ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তিনি অগাধ ধন সঞ্চয় করলেন। নিন্দুকরা প্রশ্ন তুলল দার্শনিকের কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য কোথায়? সেনেকা বললেন দার্শনিকের কাছে অভাব ও প্রাচুর্য দুইই সমান, যখন যেটা আসে সেটাকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেন। সত্যিই টাকা জমিয়েও তিনি কোনদিন টাকার গোলাম হননি। তাঁর কোন বিলাসিতা ছিল না। ভস্মীভূত রোমের পুনর্নির্মাণের কাজে তিনি তাঁর বিত্তের অধিকাংশ দান করেছিলেন। ৬২ সালে ছেষট্টি বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন, লিখলেন অমর গ্রন্থ "এপিস্চুলি মরেলিস্" বা "পত্রাবলী"। চিঠিগুলি একজন ভোগবাদী বন্ধুর উদ্দেশে লেখা। এতে গাওয়া হয়েছে আত্মহত্যার প্রশস্তি। জীবনকে দোষ দিয়ে লাভ কি? "ইহাত' কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকাইয়া রাখে নাই।"

নিয়তি শুনল কথাগুলো। নিরোর দূত এল সেনেকার কাছে রাজদ্রোহের অভিযোগ নিয়ে। সেনেকা জবাব দিলেন রাজনীতিতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই এবং নিজের দুর্বল স্বাস্থ্য সামলাতে তিনি ব্যস্ত। দূত গিয়ে প্রভুকে জানাল যে অভিযোগ শুনেও সেনেকার চেহারায় ভয় অথবা দুঃখের কোন দাগ পড়ল না। নিরো আদেশ করলেন তাঁকে নিজ হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সেনেকা এবারও ধীরভাবে শুনলেন সম্রাটের কথা—ছুরি দিয়ে কাটলেন মণিবন্ধের শিরা। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি স্ত্রী পলিনাকে সান্ত্বনা দিলেন, সেক্রেটারীকে ডেকে লেখালেন রোমানদের প্রতি তাঁর বিদায়বাণী। তারপর বাসনা হল মরবেন সক্রেটিসের মতো,—এক গ্লাস বিষ আনিয়ে পান করলেন। পলিনা সহমরণের সংকল্প করে নিজের হাতের শিরায় ছুরি চালালেন। কিন্তু নিরোর আদেশ ছিল তাঁকে মরতে দেওয়া হবে না। ডাক্তার

উপস্থিত ছিল। সে মণিবন্ধ বেঁধে দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করল। সেনেকা মুক্তি পেলেন। দণ্ড ভোগ করলেন পলিনা।

পাঁচ বছর ধরে কেমন করে সেনেকা নিরোর মন্ত্রীত্ব করেছিলেন সে এক রহস্য। একজন বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতায় সমাহিত, আর একজন ভোগ ও বিলাসিতায় অনুরক্ত। এমন আমূল বৈষম্যের মধ্যে সাম্রাজ্যের কাজ চালিয়ে যাওয়া একমাত্র স্টোইক দর্শনের গুণেই সম্ভব। বাস্তব জীবনে অসঙ্গতি দেখলে স্টোইক কল্পলোকে উড়ে যায় সেখানে খুঁজে পায় সঙ্গতি সমাধান, যেমন পেয়েছিলেন দাস এপিক্‌টেটাস ও সম্রাট অরেলিয়াস, সমাজের দূরে প্রান্ত থেকে এসে মিলেছিলেন এক কল্পনার অলকায়।

অনুমান ৫০ সালে ফ্রিজিয়ার হিরাপলিস নগরে এক দাসীর গর্ভে এপিক্‌টেটাসের জন্ম হয়। অনেক হাতবদলের পর অবশেষে তিনি মুক্তি পান এবং রোমে এসে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি এলেন এপিরাস-এর নিকোপোলিস নগরে এবং একটি পাঠশালার অধ্যক্ষ হয়ে বসলেন। এখানে তিনি যে পাঠ দিতেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করে "ডায়াট্রিবাই" বা "কথামালা" নামে প্রকাশ করেন তাঁর অন্যতম শিষ্য আরিয়ান যিনি পরে আলেকজাণ্ডারের ইতিবৃত্ত লিখে যশস্বী হন। সেনেকার "পত্রাবলী"র সঙ্গে "কথামালা" এক সুরে বাঁধা। এর মূল প্রতিপাদ্য আত্মার মুক্তিই আসল। যে স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মিক সত্তায় অচলপ্রতিষ্ঠ, বাইরের জীবনের ওঠাপড়া তার কাছে নিরর্থক। ডায়োজিনিস দাস হয়েও মুক্ত, সক্রেটিস কয়েদী হয়েও স্বাধীন, আর নিরো সম্রাট হয়েও দাস। এপিক্‌টেটাস সক্রেটিসের সঙ্গে সিনিক্‌ ও স্টোইকদের তত্ত্ব মিলিয়ে তাঁর নিরাজ নগরের স্বপ্নসৌধ রচনা করলেন।

> 'সক্রেটিসকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত 'আপনার নিবাস কোথায়?' তাহা হইলে তিনি কখনো এমন জবাব দিতেন না, 'আমি এথেনীয়' কিংবা 'আমি করিন্থীয়', সর্বদাই বলিতেন 'আমি পৃথিবীর'। দার্শনিকরা ঈশ্বর ও মানুষের আত্মীয়তা সম্পর্কে যাহা বলিয়া থাকেন তাহাতে কোন সত্যতা থাকিলে আমাদের সক্রেটিসের রাস্তায় চলা ভিন্ন আর কি করণীয় থাকিতে পারে?' (১।৯।১-২)[১]

যারা বিশ্বনগরের নাগরিক ক্ষুদ্র নাগরিক জীবনে তাদের কোন স্থান নেই।

> 'জিজ্ঞাসা করিতে পার রাষ্ট্রজীবনে সিনিক কোন কাজ করিবে কিনা। মূর্খ! তুমি কি সিনিকদের কর্মক্ষেত্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সার্বজনীন ক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছ? তুমি কি চাও যে কেহ এথেন্সে গিয়া সরকারী টাকাকড়ির হিসাবপত্র লইয়া বসুক, যখন তাহার উচিত রোমান-করিন্থীয়-এথেনীয়-নির্বিশেষে সকল লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং তাহাদের সরকারী তহবিলের হিসাব নিকাশ লইয়া নয়, লড়াই ও আপস লইয়া নয়,—আলোচনা করা উচিত তাহাদের সুখ দুঃখ, সফলতা ও বিফলতা, দাসত্ব ও মুক্তি এই সব প্রসঙ্গ লইয়া?' (৩।২২। ৮৩—৮৪; বার্কার ৩১৬)।

নারীর যৌথত্ব সম্বন্ধে এপিক্‌টেটাস ডায়োজেনিস ও জেনোর মত চরমপন্থী ছিলেন না। ভোজের আসরে যেমন ভোজ্যসম্ভার সকলের জন্যে, কিন্তু প্রত্যেকে পায় পরিবেশিত

[১] কথামালা। আর্নেস্ট বার্কার : ফ্রম আলেকজাণ্ডার টু কন্‌স্টেন্‌টাইন (কথা-সংগ্রহ)। অক্সফোর্ড, ১৯৫৬। ৩১৩ পৃষ্ঠা। পরবর্তী পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

অন্ন, কেউ অন্যের থালার ওপর লোভ করে না; সমাজে মেয়েদের ওপর ভোগদখলও তেমনি (২।৪।৮—১০; বার্কার ৩১৬)।

ঈশ্বরের স্তুতিতে এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে এপিক্‌টেটাস খ্রীস্টানদের সমগোত্রীয়। মানবতার ধর্মে তিনি যীশুখ্রীষ্টের চেয়েও অগ্রগামী—তিনি দাসত্বপ্রথা ও প্রাণদণ্ডের নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে অপরাধ মানসিক রোগের লক্ষণ—তার শাস্তি না হয়ে চিকিৎসা হওয়া দরকার। ক্ষেত্র বিশেষে তিনিও ছিলেন আত্মহত্যার সমর্থক। যা শুভ ও সুন্দর তাকে ঢেকে যখন কুৎসিত অমঙ্গলের ছায়া নেমে আসে তখন মৃত্যুই শ্রেয়, কারণ সৎ লোকের কাছে মৃত্যু অতি আকিঞ্চিৎকর।

সেনেকা ও এপিক্‌টেটাসের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস। তিনি নির্বিকার স্টোইক চিত্তের আর এক দৃষ্টান্ত। তখন জার্মান উপজাতিরা ড্যানিয়ুব নদী পেরিয়ে সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে হানা দিচ্ছে। সম্রাট তাদের রুখবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। সারাদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যচালনা করে রাত্রে শিবিরে এসে তিনি লেখেন তাঁর "টা আই অটন" বা স্বগতোক্তি। দিনান্তে সেনাধ্যক্ষ হন দার্শনিক :

> 'মাকড়সা একটা মাছি ধরিতে পারিলে মনে করে সে একটা মস্ত কাজ করিয়াছে। একই ভাবনার উদয় হয় একটা খরগোসকে শিকার করিলে... কিংবা স্যামার্শিয়ান-দিগকে বন্দী করিতে পারিলে।... ইহারা সবাই কি দস্যু নয়?' (১০।১০)

দার্শনিকের বিশ্বনগর প্রজ্ঞানের রাজ্য, জ্ঞানীর মানসলোকে তার অধিষ্ঠান।

> 'যদি সর্বসাধারণের বোধশক্তি থাকে তবে বুদ্ধিবৃত্তিও সাধারণ বৃত্তি যাহার বলে আমরা সকলে বুদ্ধিমান জীব। তাই যদি হয় তাহা হইলে বুদ্ধির যে অংশ আমাদিগকে বলিয়া দেয় কি করিতে হইবে আর কি করা চলিবে না তাহাও সকলের মধ্যে বিদ্যমান। তাহা হইলে আইনের বিধানও তাই। যদি বিধান সর্বসাধারণের হয় তাহা হইলে আমরা সবাই এক রাষ্ট্রের নাগরিক। তাই যদি হয় তাহা হইলে নিখিল বিশ্ব যেন এক রাষ্ট্র বা নগর। এমন আর কি রাষ্ট্রসংস্থা আছে যাহার সমান অংশীদার সমস্ত মানব জাতি? সার্বজনীন এই রাষ্ট্র বা নগর হইল মূল যাহা হইতে আমরা পাইয়াছি আমাদের বোধশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আইনের বিধান।' (৪।৪; বার্কার ৩১৯-২০)।

কিন্তু এই মায়াময় কল্পনালোকের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের সম্পর্ক কি? অত্যন্ত বাস্তব এ সাম্রাজ্য কি জ্ঞানীর ধ্যানলোকের বহির্ভূত? তা নয়। ব্যক্তি যেমন বিশ্বপ্রকৃতির একটি বিন্দু, সাম্রাজ্য তেমন প্রজ্ঞান রাজ্যের একটি কণিকা। যদি পার্থিব রাষ্ট্রে মানুষ সত্যভ্রষ্ট হয়, সত্যনিষ্ঠ আত্মা তাতে কাতর হয় না, সে প্রজ্ঞানের নিঃসীম নীলিমায় পাখা মেলে পাড়ি দেয়। যে আত্মা নিয়তির উত্থানপতনে বিচলিত হয় না, সে অন্তহীন কালাকাশ জুড়ে বিধৃত, "বস্তুর আবর্তনের সঙ্গে সেও হয় আবর্তিত" "অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সে হয় একাত্ম" (১১।১)।

সম্রাট যখন একদিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত অন্যদিকে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন এমন সময়ে বুঝতে পারলেন তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি অন্নজল ত্যাগ করলেন। ষষ্ঠ দিনে পরম প্রশান্তির মধ্যে তাঁর প্রাণবিয়োগ হল।

এশিয়া ও ইয়োরোপের সঙ্গমে যে মাটিতে সিনিক ও স্টোইকদের ফসল ফলেছিল সেই মাটিতেই বীজ বুনলেন নাজারেথের যীশুখ্রীষ্ট, সেই লেভান্টের জলে বাতাসে নতুন ফসল উঠল। রোমান স্টোইকরা পূর্বতনদের সাম্যবাদকে অব্যাহত রেখে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিটমাট করে ফেললেন। এই নবরূপে স্টোইকবাদ খ্রীষ্টান দার্শনিকদের হাতে সমর্পিত হল। যীশু-খ্রীষ্ট প্রচার করলেন সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী, প্রতিবেশীর হিতের জন্যে বিত্ত উৎসর্গ করার নির্দেশ। তাঁর বিখ্যাত বচন "ঈশ্বরের রাজ্য তোমার অন্তরে" (লিউক ১৭/২০) স্টোইকদের আত্মার স্থিরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনী যুবকের প্রতি তাঁর উপদেশ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের বিলিয়ে দাও, তাহলে স্বর্গের সম্পত্তি পাবে তুমি (ম্যাথু ১৯/২১)। গরীবদের প্রতি তাঁর আশ্বাস যে ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই (লিউক ৬/২০)। কাউট্স্কী প্রমুখ[২] অনেকের মতে যীশুখ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যদের চার্চ ছিল কম্যুনিস্ট, সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সভ্যরা সব কিছু একসঙ্গে ভোগ করত।

> 'তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে অভাবগ্রস্ত; কারণ যাহাদের জমিজমা অথবা ঘরবাড়ি ছিল তাহারা সব বেচিয়া দিয়া বিক্রির টাকা আনিয়া গুরুর পায় রাখিত : এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন মত জিনিসপত্র বিতরণ করা হইত' (অ্যাক্ট্স্ ৪/৩৪—৩৫)।

যে সব স্বার্থপর ধনীরা উদ্বৃত্ত অর্থ বিলিয়ে না দিয়ে সঞ্চয় অথবা ভোগ করে কোন কোন ধর্মগুরু তাদের চোর বলে গালি দিতে কসুর করেননি। সেণ্ট জেম্স্-এর বাক্যবাণ প্রুধোঁর চেয়েও ধারাল। প্রুধোঁ সম্পত্তিকে বলেছেন চৌর্য। জেম্স্ সাম্যবাদকে চার্চের দেওয়ালের বাইরে নিয়ে এসে সামাজিক ধনবৈষম্যের ওপর নিক্ষেপ করলেন।

> 'ধর তোমাদের সভায় যদি একজন আসে সোনার আংটি ও সুন্দর পোশাক পরিয়া আর যদি একজন দীন দরিদ্র লোক আসে মলিন বেশে, তোমরা সসম্মানে সুন্দর পোশাক পরা লোকটিকে বলিবে 'আসুন, এই উত্তম আসন পরিগ্রহ করুন'; আর গরীব লোকটিকে বলিবে 'ঐখানে দাঁড়া কিংবা আমার পাদানির নীচে বস্'। ...শোন আমার প্রিয় ভাইরা! এই পৃথিবীতে যাহারা দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসে ধনী তাহাদিগকেই কি ঈশ্বর তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন নাই, যে রাজ্য তাঁহার ভক্তদের জন্য প্রতিশ্রুত?' (জেম্স্ ২।২-৫)

> 'ওহে ধনীরা! যাও, তোমাদের উপর যে দুর্গতি আসিতেছে তাহার জন্য কান্নাকাটি কর। তোমাদের ধনদৌলত দূষিত, তোমাদের সাজসজ্জা কীটদষ্ট, তোমাদের সোনারূপা হতশ্রী।...তোমরা শেষ দিন পর্যন্ত সঞ্চয় করিয়াছ। তাকাইয়া দেখ! যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেতের ফসল তুলিতেছে অথচ যাহা-দিগকে তুমি বঞ্চনা করিয়াছ তাহারা আওয়াজ তুলিতেছে। ফসল-তোলা বঞ্চিত মজুরদের আওয়াজ পৌঁছিয়াছে সেবাওথ-এর প্রভুর কানে' (৫/১—৪)।

> 'সুতরাং ভাইরা! প্রভুর আগমনের অপেক্ষায় ধৈর্য ধর। দেখ না, চাষী অপেক্ষা করে জমির মূল্যবান ফসলের জন্য, যতদিন সে না পায় প্রথম ও শেষ বর্ষণ ততদিন সে ধৈর্যধারণ করে। তোমরাও ধৈর্য ধর; হৃদয়কে স্থির কর; কারণ প্রভুর আগমনের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে' (৫/৭—৮)।

[২] কমিউনিজ্ম্ ইন সেণ্ট্রাল ইয়োরোপ ইন দি টাইম অব দি রিফর্মেশন, লণ্ডন ১৮৯৭।

বাইবেল-এ এ ধরনের বিপ্লবাত্মক উক্তি অবশ্য ব্যতিক্রম। যীশুখ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রথম শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন রক্ষণশীল। সেণ্ট পীটার ও সেণ্ট পলের মতবাদে উগ্র সাম্যবাদের স্থান ছিল না। দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্টের লেখনীতে সম্পত্তির সমর্থন ভারি চমৎকার :

> '(সম্পত্তি বর্জনের অপেক্ষা) কত বেশী কার্যকরী তার বিপরীত কাজ? যদি কাহারও যথেষ্ট পরিমাণ অর্জিত সম্পত্তি থাকে তাহা হইলে সে একাধারে পুনরায় সম্পত্তি অর্জনের চেষ্টা ও কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে এবং যাহারা সাহায্যের যোগ্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে। যদি কাহারও কিছু না থাকে তাহা হইলে ভাগ বাটোয়ারার জন্য পৃথিবীতে থাকিবে কি? প্রভুর যে অন্যান্য সুন্দর উপদেশ, এই মতবাদকে (সম্পত্তি বিলোপ ও সাম্যবাদ) তার বিরোধী এমন কি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া আর কি মনে করা যায়?... কেমন করিয়া লোকে ক্ষুধার্তকে অন্ন দিবে, তৃষ্ণার্তকে জল দিবে, নগ্নকে বস্ত্র দিবে, গৃহহীনকে আশ্রয় দিবে... যদি শুরুতেই সকলেরই এই সব বস্তুর অভাব থাকে?'[৩]

যীশুখ্রীষ্ট নিজেও সমাজবিপ্লবী ছিলেন না। যতই তিনি সমাজসাম্য কামনা করুন না কেন বিত্তহীন নিরাজ সমাজ তিনি চাননি। রাষ্ট্র, ব্যক্তিসম্পত্তি ও দাসপ্রথা তিনি পছন্দ না করলেও মেনে নিয়েছেন। সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি, বরং যারা ঈশ্বরের রাজ্য আচমকা দখল করতে চায় তাদের তিরস্কারই করেছেন (ম্যাথু ১১/১২)। নিজের অন্তর শুচী কর, লোভ ও হিংসা ত্যাগ কর, তখন আর আইন অথবা রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। যীশু নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। নাগরিক জীবন থেকে তিনি প্রস্থান করেছিলেন আত্মিক জগতে, রাষ্ট্র থেকে ঈশ্বরে। রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের প্রতি উপেক্ষা।

কিন্তু এই উপেক্ষার মধ্যেই ছিল কম্যুনিজম ও এনার্কিজম-এর বীজ। তাঁর জীবন, মৃত্যু ও বাণী নির্ভুল ভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে জীবনের আত্মিক বিকাশের পথে সরকারী আইন ও শাসন একেবারে অবান্তর। সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে তিনি চাননি। যখন ফ্যারিসীরা তাঁকে এইরূপ সংঘর্ষে জড়াতে চেয়েছিল তিনি এই বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন 'সীজারের যা পাওনা তাহা সীজারকে দাও, ঈশ্বরের যা প্রাপ্য তাহা ঈশ্বরকে দাও' (ম্যাথু ২২/২১)। এর অর্থ পার্থিব শাসন ও ঐশ্বরিক শাসন উভয়ের সহ-অস্তিত্ব সম্ভব। তা হলেও শেষেরটির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পার্থিব শাসনের উৎপত্তি পাপ থেকে। আদিতে স্বর্গোদ্যানে প্রথম মানবমিথুন ছিল নির্মল নিষ্পাপ। তাদের স্খলনের পর থেকে এল শৃঙ্খল, শাসন। মানুষের অনাচার বন্ধ করবার জন্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হল—মানুষের হীন বৃত্তিগুলো দমন করা হল তার কাজ। যার জন্ম ও অস্তিত্ব পাপে, পাপের অবসানের সঙ্গে সেই নিকৃষ্ট সংস্থার বিলুপ্তির অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় শতকে তার্তুলিয়ান যীশুর কথাটির অভিনব ব্যাখ্যা করে বললেন যে পার্থিব রাষ্ট্র ঐশ্বরিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমান স্তরে থাকবে এ তিনি মোটেও বলতে চাননি। পার্থিব রাষ্ট্র ইতর জনের জন্যে—যারা জীবনের নিকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে ব্যস্ত—এই ইংগিতই তিনি করতে চেয়েছেন।

[৩] কি ডিভে স্যালভেট্র ১৩; বার্কার ৪২৮।

'তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, যে টাকার উপর সীজারের ছাপ আছে তাহা দিতে হইবে সীজারকে, যে মানুষের উপর ঈশ্বরের ছাপ আছে তাহা দিতে হইবে ঈশ্বরকে। ইহার অর্থ লোকে সীজারকে দিবে টাকা আর ঈশ্বরের কাছে সম্পদান করিবে নিজেকে। নতুবা সবই যদি সীজারের হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের জন্য থাকিবে কি?' (ডে আইডললেট্রিয়া সি. ১৫; বার্কার ৪৫৬)

সেন্ট পীটার ও সেন্ট পল তাঁদের পত্রাবলীতে দাসদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রভুদের সেবা ও মান্য করতে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবিধানের বিরোধিতা করা দূরে থাকুক সেন্ট পল তার প্রতি আনুগত্যই কামনা করেছেন। কারণ রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের আদেশ পালন করে খ্রীষ্টান নাগরিক ঈশ্বরের আদেশই পালন করে।

মোটের ওপর নিউ টেস্টামেণ্টে দেখা যায় নরম ও গরম দুই চরম মতবাদের একটা আপস-রফা। রাষ্ট্র, ব্যক্তিসম্পত্তি ও দাসপ্রথা এতে স্বীকৃত। তবে রাষ্ট্রের শাসন হবে ন্যায়পরায়ণ, সম্পত্তি ব্যয় হবে দরিদ্রের সেবায়, দাসদের প্রতি করতে হবে সদয় ব্যবহার। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ মতবাদের ভিতরে ছিল বিপ্লবের বীজ যা অঙ্কুরিত হয়ে ফল প্রসব করেছিল দেড় হাজার বছর পরে।

ক্রমশ খ্রীষ্টান ধর্ম রাষ্ট্র ও জাতির গণ্ডি পেরিয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। খ্রীষ্টানদের সামনে উপস্থিত হল দেশ ও জাতির চেয়ে এক মহত্তর সত্তা, দেশপ্রেম ও রাজ-ভক্তির চেয়ে এক গভীরতর অনুরক্তি। এর সামনে যাবতীয় জাগতিক ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়, মানুষের মূল্য হয় মানুষ হিসাবে। সেন্ট পল বলেছেন :

'ইহুদী কিংবা গ্রীক বলিয়া কিছু নাই, দাস কিংবা মুক্ত বলিয়া কিছু নাই, পুরুষ কিংবা স্ত্রী বলিয়া কিছু নাই; কারণ যীশুখ্রীষ্টের কাছে তোমরা সবাই এক' (গ্যালেশিয়ানদের প্রতি পত্র ৩।২৮)।

সেন্ট অগস্টিনের ঈশ্বরের নগর 'সকল ভাষার তীর্থযাত্রীদের মিলনক্ষেত্র'। কথাগুলো যেন স্টোইকদের প্রতিধ্বনি। খ্রীষ্টান শাস্ত্রকারদের চোখে নামল স্টোইকদের স্বর্ণযুগের স্বপ্ন। প্রকৃতির বিধানকে ঈশ্বরের বিধানে প্রবর্তন করে তাঁরা এই স্বপ্ন রেখে গেলেন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রকৃতিবাদীদের জন্যে। স্বর্ণযুগে মানুষ ছিল নিষ্পাপ। তারপর হল অধঃপতন। তার স্বভাব পাপবিদ্ধ হলেও যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহে সে ফিরে যেতে পারে আদিম শুদ্ধ সত্তায়। যে ঈশ্বরের রাজ্য অতীতে বিদ্যমান ছিল ভবিষ্যতে তার আবির্ভাব খুবই সম্ভব।

সেন্ট অগস্টিন (৩৫৩-৪৩০) তাঁর "ডে সিভিটাটে ডাই" বা 'ঈশ্বরের নগর' নামক গ্রন্থে সেনেকার প্রকৃতিবাদকে দৈবরাগে রঞ্জিত করে পরিবেশন করেছেন। আদমের প্রথম পাপ থেকে মানুষের পতন হল, এল পাপবৃত্তি, পিছনে পিছনে এল অনাচার, অমঙ্গল, জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা। পাপকে সংযম করে যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে শাসনের প্রয়োজন হল।* শাসনের দায় নিল রাষ্ট্র—'পৃথিবীর নগর'। যার জন্ম ও স্থায়িত্ব মানুষের বিকারে তা কখনো শুভ হতে পারে না। কিন্তু এ এক অতি-আবশ্যক অশুভ যা বর্জন করাও যায় না। ন্যায়বিচার ও শান্তিরক্ষার জন্যে রাষ্ট্র,—এতেই তার সমর্থন। 'ন্যায়বিচার যদি না থাকে তা হলে রাজ্য-শাসন আর দস্যুবৃত্তিতে তফাত কি?' (৪/৪) রাজা ও দস্যু উভয়ে সমান লোভী, একই

* শব্দ সেনেকার লেখায় নয়, মহাভারতেও রাষ্ট্রের জন্ম কাহিনী এইরূপ। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৫ "চতুরঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

প্রকারে তারা লুঠের মাল ভাগ করে, শুধু রাজার কোন ভয়ভাবনা নেই, দস্যুর আছে শাস্তির ভয়।

'পৃথিবীর নগরের' ওপর অধিষ্ঠিত 'ঈশ্বরের নগর',—স্টেটের ওপর চার্চ, যার হাতে আছে মানুষের ধর্মমোক্ষের দায়। ঈশ্বরের নির্দেশে ঐহিক বিধান 'পৃথিবীর নগরের' ওপর বর্তিত,—চার্চ রাষ্ট্রকে ভার দিয়েছে সৎ খ্রীষ্টান জীবনের উপযোগী পার্থিব পরিবেশ রচনা করবার। রাষ্ট্রকে স্বীকার কেন, সমর্থন না করে চার্চের তখন গত্যন্তর ছিল না। রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা দরকার ধর্মপ্রচারের জন্যে, আরো বেশী দরকার সম্পত্তির ওপর আক্রমণ রুখবার জন্যে। চার্চের হাতে তখন প্রচুর বিত্ত—প্রথম ধর্মগুরুদের আমলের সরল নিষ্কাম জীবনযাত্রা আর নেই। খ্রীষ্টের বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে এই বৈশ্যবৃত্তির সামঞ্জস্য কোথায়? সেন্ট অগস্টিন চেষ্টা করলেন বৈষম্যের মীমাংসা করতে। তিনি বললেন প্রাকৃতিক জীবনে সম্পত্তি ছিল সার্বজনীন কিন্তু প্রত্যেকের অধিকার ছিল প্রয়োজন মত যৌথ ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করবার। অবশিষ্ট অংশ থাকত সকলের জন্যে। তিনি এবং তাঁর সমকালের তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিসম্পত্তি ও যৌথসম্পত্তি ঠিক এর কোনটারই পক্ষ গ্রহণ করেননি। ব্যক্তিগত অভাব মেটাবার মত যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জন করবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। আবার সেই সঙ্গে আছে উদ্বৃত্ত বিত্ত সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করবার দায়িত্ব। এমন কি ভিক্ষাদানও দাক্ষিণ্য নয়, এ নিছক ন্যায়ধর্ম, নিজের উদ্বৃত্তটুকু যৌথভাণ্ডারে ফিরিয়ে দেওয়া।

আদিম প্রাকৃতিক বা ঈশ্বরিক সমাজের সমতা ও সৌভ্রাত্রের কীর্তনে যে নীতিকথার সূত্রপাত তার সমাপ্তি হল রাষ্ট্র, চার্চ ও সম্পত্তির বন্দনায়। দাসপ্রথা, যুদ্ধ এবং সভ্য-জীবনের যত কিছু উপসর্গ সমস্ত সমর্থন লাভ করল। শাস্ত্রকাররা রাষ্ট্র ও সমাজবৈষম্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। খ্রীষ্টান দর্শনে প্রকৃতিবাদের সংকরণ হল। যে প্রকৃতির নিয়ম ছিল স্থান কাল নির্বিশেষে অনাবিল বিশুদ্ধ, যে নিয়ম অন্তরের সংযমে বাইরের শাসনে নয়, মানুষের পতনের পর সে নিয়ম হল আপেক্ষিক, তার বন্ধন হল বাহ্য, প্রয়োজন-সাপেক্ষ, রাষ্ট্র, সম্পত্তি ও দাসপ্রথা এল প্রকৃতির স্বাক্ষর নিয়ে।

এই সূত্রের একটি মাত্র নিপাতন দেখা যায়। প্রাচী ও প্রতীচীর সঙ্গমতীর্থ আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রীষ্টান দর্শনের সঙ্গে প্রাচ্য মিস্টিসিজম-এর মিশাল হল। চার্চের ঐকতানে নস্টিকদের সুর মিলল না। এঁদের একমাত্র ধ্যান হল ঈশ্বরলাভ—ব্রত হল যোগ, সন্ন্যাস ও ইন্দ্রিয় সংযম। এঁদের মধ্যে কারপোক্রেটিস নামে একজন আরও বেসুরে গাইলেন। তিনি বললেন অনাসক্তি ও কৃচ্ছ্রসাধন দিয়ে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। বাস্তব জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে মুক্ত হও, আত্মবাদন কর এর আনন্দ। ওল্ড টেস্টামেণ্টের ভগবান জিহোভা হলেন ডেমুর্গস—নিকৃষ্ট ও স্বৈরাচারী দেবতা। তাঁর খামখেয়ালে দশ আজ্ঞার নৈতিক শাসন মানুষের ওপর আরোপিত হয়েছে। যাঁরা নস্টিক এই নৈতিক বিধান মানবে না—নিকৃষ্ট দেবতার প্রতি তার কোন আনুগত্য নেই। কারপোক্রেটিস ও তাঁর পুত্র ইসিডোরাস উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মহিমা কীর্তন করে নূতন ভাগবত রচনা করলেন।

"এই নববিধানের খ্রীষ্টান ধর্মে প্লেটোর প্রভাব সুগভীর। এতে নস্টিকবাদের বৈপরীত্যের ধারণাগুলি পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে। এতে দেখান হয়েছে যে ভালমন্দ কেবল খামখেয়ালীর হুকুম, অত্যাচারী বিশ্ব-শাসকরা এগুলো মানুষের ওপর চাপিয়েছে। এই

অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছেন যীশু। অন্যদের মত তিনিও ছিলেন মানুষ, কিন্তু তাঁর আত্মার পবিত্রতা ছিল অসাধারণ। তাই ঊর্ধ্বলোকে যা তিনি দেখেছেন তা স্মরণ রাখতে পেরেছেন এবং সেই ঊর্ধ্বলৌকিক শক্তির বলে বিশ্ব-শাসকদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছেন। যে সকল আত্মা তাঁর পথের দিশারী তারাও সেই শক্তির অধিকারী, তারা যীশুর চেয়েও উচ্চতর স্তরে উঠতে পারে। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে নানা স্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাই মৃত আত্মার হয় পুনর্জন্ম। কিন্তু শক্তিমান আত্মা এক জীবনেই সকল অনুভূতির মধ্য দিয়ে ঊর্ত্তীর্ণ হয়ে নিম্নতন বিধান থেকে মুক্ত হতে পারে।"[১]

ফারপোক্রেটিস বিদ্রোহীদের আহ্বান করলেন রাষ্ট্র, আইন, নীতিশাস্ত্র ও সম্পত্তির শৃঙ্খল ভাঙবার জন্যে। তাঁর নস্টিকগোষ্ঠী সিনিক ও স্টোইকদের মত নৈরাজ্যবাদী যদিও তাঁদের রাষ্ট্র-বিরোধিতার যুক্তি ছিল কিছু স্বতন্ত্র। সিনিক ও স্টোইকদের মত এঁদেরও কয়েকটি ছিন্নপত্র ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। এঁদের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা পাওয়া যায় প্রতিবাদীদের রচনায়। চার্চের গুরু আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্ট, ইরেনিউস, ইউসেবিয়াস ও এপিফেনিয়াস সবাই এঁদের নিন্দায় পঞ্চমুখ। তাঁরা একবাক্যে বলেছেন যে এই অন্যচারীরা ভালমন্দর পার্থক্য দূর করতে চায় এবং এদের আসক্তি নিরঙ্কুশ যৌন রমণে। আক্রমণ যে বাক্যবাণে আবদ্ধ ছিল না তাতে সন্দেহ নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার অরাজকীরা কয়েক বছরের নির্যাতনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যীশুখ্রীষ্ট যখন সীজার ও ঈশ্বরের এক্তিয়ার মেপে দিচ্ছিলেন—সেই সময়ে সেনেকাও অবতারণা করলেন দুই রাজ্যের প্রসঙ্গ—সিভিটাস্ ডাই এবং সিভিটাস হিউম্যানা।

> 'আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে দুটি পৃথক যৌথরাজ্যের ধারণা। একটি মহান এবং যথার্থ সার্বজনীন সমাজ দেবতা ও মানুষ লইয়া। ইহাতে আমাদের দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না এবং ইহার সীমানা আমরা মাপি শুধু সূর্যের উদয়াস্ত দিয়া। অন্যটি হইল সেই সমাজ যাহাতে ঘটনাচক্রে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি। যেমন এথেন্স, কার্থেজ কিংবা অন্য কোন নগর যাহা সকল লোকের নহে, মাত্র কয়েকজন লোকের' (ডে অটিও ৪।৩১; বার্কার ২৩৪)।

তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে অরিগেন এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে ঈশ্বরের প্রাকৃত নিয়ম এবং মানুষের কৃত্রিম নিয়ম দুয়ের মধ্যে গণ্ডি টেনে প্রথমটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলেন।

> 'সুতরাং আমাদের সামনে দু'রকমের বিধান আছে। একটি প্রকৃতির বিধান যাহা ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত, অন্যটি নগররাষ্ট্রের লিখিত আইন। যেখানে লিপির বিধান ঈশ্বরের বিধানের পরিপন্থী নহে সেখানে নাগরিকদের ইহাকে তাহাদের প্রকৃতির বহির্ভূত বলিয়া বর্জন না করাই উচিত। কিন্তু যখন প্রকৃতির বিধান, অর্থাৎ ঈশ্বরের বিধান লিপির বিধানের বিরুদ্ধে নির্দেশ দিতেছে তখন স্থির হইয়া শোন তোমার অন্তরের বাণী—শাস্ত্রকারদের অভিপ্রায় ও লিখনকে বিদায় দাও, আসল শাস্ত্রকার ঈশ্বরের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দাও, তাঁহার নির্দেশ

* এনসাইক্লোপীডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স্, ১৯২০ : ই. এফ. স্কট : নস্টিসিজ্ম্।

> অনুসারে জীবন যাপন কর তাহাতে বিপদ, দুঃখ ও অপযশ যা আসে আসুক' (কঁত্রা কেল্সাম ৫।৩৭; বার্কার ৪৪২)।

পরের শতকে সেণ্ট অগস্টিন পার্থিব ও ঈশ্বরিক দুই রাজ্যের অবতারণা করলেন। পরবর্তী ধর্মনায়কদের হাতে খ্রীষ্টানজগত ও মানবজগতের সমীকরণ হল। এই অভেদ অদ্বৈত বিশ্বসমাজের প্রভু যীশু, পৃথিবীতে তাঁর প্রতিভূ চার্চের গুরু পোপ। পোপ রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্মনায়ক। কিন্তু ধর্মনায়ক নিজ হাতে রাজদণ্ড ধারণ করেন না—এ দণ্ড তিনি রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করেছেন। বাহ্যত রাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র থেকে পৃথক হলেও মূলত ধর্মতন্ত্র থেকেই এর উৎপত্তি।

"রাষ্ট্রত আকারে রাষ্ট্রের উদ্ভব পৃথিবী থেকে, চার্চের মত স্বর্গ থেকে নয়। চার্চের পূর্বেও রাষ্ট্র ছিল, চার্চের বাইরেও রাষ্ট্র আছে—রাষ্ট্রের সে সত্তা পতিত মানবের স্খলিত চরিত্র থেকে উদ্ভূত। সুতরাং তার জন্মকালিমা মুছে ফেলবার জন্য এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত মানবসমাজের এক বৈধ অংশ হিসাবে তাঁর সম্পত্তি লাভ করবার জন্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন চার্চের কাছ থেকে সনদ লাভ করা। এই হিসাবে রাষ্ট্রশক্তি চার্চ থেকে তার আসল সত্তা লাভ করেছে এবং রাজা মহারাজারা চার্চ থেকে পেয়েছেন শাসন করবার অধিকার।"[১]

এই সূত্রের প্রধান ভাষ্যকার পোপ সপ্তম গ্রিগরী। তাঁর মতে রাজশক্তির উৎস শয়তান। কুলোকের মনে যে স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার লোভ তা থেকে এর উৎপত্তি। এমন বহু লোক আছে যাদের মনে ঈশ্বরের বিধান মানবার মত ধর্মভাব নেই। তাদের শাসন করবার জন্যেই রাষ্ট্র। যখন সকলে খ্রীষ্টানভাবে অনুরঞ্জিত হবে তখন রাষ্ট্রের আর দরকার হবে না, চার্চের মাধ্যমে ঐহিক ব্যাপারের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রেসাস, ওখাম প্রমুখ নৈয়ায়িকরা প্রতিবাদ করলেন—চার্চ ও স্টেট ঈশ্বরের দুই তরবারি; স্টেট চার্চের অধীন নয়; এদের কাজ পৃথক এবং এরা পৃথকভাবে ঈশ্বরের কাছে দায়ী। এঁদের যুক্তি টিকল না। কারণ তাহলে কি সমাজ জীবটি এক দু মাথাওয়ালা দৈত্য বিশেষ? টমাস একুইনাস প্রচার করলেন চার্চ নিখিল মানবজাতির একতার প্রতীক, এ 'আত্মিক রাষ্ট্র'। যে চার্চ এক এবং অদ্বিতীয় তার শাসন ও বিধান অসপত্ন দেশ জাতি নির্বিশেষে সকল খ্রীষ্টান এই সার্বভৌম ধর্মসমাজের অধিবাসী। এই দর্শনের প্রেরণায় চার্চ আত্মার জগত থেকে ভ্রষ্ট হয়ে লৌকিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হল। এরই প্রতিক্রিয়া উইক্লিফ্ ও হাস্-এর বিদ্রোহ, রিফর্মেশনের বিপ্লব—যার প্লাবন থেকে নিঃসৃত হল ধর্মনিষ্ঠ মুক্তিপিপাসুর স্বপ্নসাধ, চার্চের লৌকিক প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করে তার স্থানে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য স্থাপন করবার কল্পনা।

মধ্যযুগের চার্চ ও স্টেটের দ্বন্দ্ব নিরাজবাদী ও রাষ্ট্রবাদীর দ্বন্দ্ব নয়, দুই প্রভুত্বলোভী লৌকিক সঙ্ঘশক্তির দ্বন্দ্ব। খ্রীষ্টান ধর্মোন্মাদনার চরম অবস্থায় চার্চ স্টেটকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল। যাজক ও হাকিম উভয়ের ক্ষমতা চার্চের করায়ত্ত হয়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধর্মবিশ্বাসের যুগে নৈরাজ্যবাদীর সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে স্টেটের বিরুদ্ধে নয়, চার্চের বিরুদ্ধে।

চার্চ থেকে সরল যৌথ জীবনযাপনের রেওয়াজ উঠে যাবার পর সাম্যবাদের আদর্শ আশ্রয় পেল খ্রীষ্টান মঠগুলিতে। ষষ্ঠ শতকে বেনেডিক্টাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই

* অটো গীর্কে : পলিটিক্যাল থিয়োরিজ অব দি মিডল্ এজেস্। অনুবাদ : এফ. ডব্লিউ. মেট্ল্যাণ্ড। কেম্ব্রিজ, ১৯৫১। ১২-১৩ পৃষ্ঠা।

আদর্শের উজ্জীবন হল। তারপর থেকে চার্চের ভেতরে ও বাইরে সাম্যবাদের আন্দোলন ঘনিয়ে উঠল। ১২০০ সালের কাছাকাছি ফ্রান্সের এল্‌বিজেন্সিয়ান বিদ্রোহীরা ধনসাম্যের দাবি নিয়ে আওয়াজ তুলল, চার্চ, পোপ ও তাদের সম্পত্তিকে খ্রীষ্টদ্রোহী বলে আক্রমণ করল। বিদ্রোহীদের আর এক ঘাঁটি হল বোহেমিয়া। এখানে সরল ধর্মজীবনের সঙ্গে সাম্যবাদের আদর্শ মিশিয়ে হাস্‌ চার্চের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। প্রাগে বিদ্রোহীদের প্রথম জয়লাভের পর তাদের একদল ট্যাবর নগরে এক নূতন চার্চের পত্তন করল। খ্রীষ্টের উপদেশ মত নিষ্ঠাবান জীবনযাপন হল এদের ব্রত। ক্যাথলিক চার্চের পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রিয়াকাণ্ড সব বাতিল করে এরা রাখল কেবল ব্যাপটিজম্‌ ও কম্যুনিয়ন। এদের বিশ্বাস ছিল যে যীশু আবার ফিরে আসবেন, পৃথিবীতে স্থাপন করবেন তাঁর রাজ্য, সে রাজ্যে থাকবে না চার্চ, রাষ্ট্র ও সম্পত্তি, থাকবে না মানুষের গড়া বিধি-নিষেধ, রাজস্ব, বিবাহ। শেষে খ্রীষ্টের আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করার তর সইল না। ট্যাবরাইটরা তাদের স্বর্গীয় স্বপ্নরাজ্য গড়বার কাজে নেমে পড়ল।

এদের মধ্যে আবার দেখা দিল এক চরমপন্থী দল। পীটার চেল্‌চিকী (১৩৯০-১৪৬০) নামে একজন কৃষাণ দার্শনিক টলস্টয়র মতো উগ্র শান্তিবাদ ও নৈরাজ্যবাদ প্রচার করলেন। "তিনি বিত্তবান ও ক্ষমতাপন্নদের আক্রমণ করলেন, যুদ্ধ ও প্রাণদণ্ডকে হত্যা বলে নিন্দা করলেন এবং এক সমান সমাজের ছবি তুলে ধরলেন যেখানে প্রভু ও ভূমিদাস নেই, কোন প্রকার আইনকানুন নেই। শিষ্যদের তিনি বললেন খ্রীষ্টানধর্মকে নিউ টেস্টামেণ্টে যেমনটি পেয়েছ ঠিক সেইভাবে নাও, শুধু সাবালককে ব্যাপটাইজ বা শুদ্ধ কর, পৃথিবী ও পার্থিব রীতিনীতি থেকে ফিরে এস, ত্যাগ কর শপথগ্রহণ শিক্ষা শ্রেণীভেদ ব্যবসায়ী বৃত্তি ও নাগরিক ধর্ম, বরণ করে নাও দারিদ্র্য, বর্জন কর সভ্যতা ও রাষ্ট্রকে, জমির ফসল তুলে সংস্থান কর জীবিকার।"[৭] এঁর চেয়েও উগ্র এক গোষ্ঠী ছিল। তারা চাইত নির্বসন দিগম্বর হতে এবং বিবাহ প্রথা তুলে দিয়ে নারীদের যৌথভাবে ভোগ করতে।

মতভেদের মীমাংসা করতে গিয়ে ট্যাবরাইটদের দুই দলে লড়াই লেগে গেল। শান্তি ও মুক্তির পূজারীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উপলক্ষে উপস্থিত হল আইনকর্তা শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। চেল্‌চিকীর শিষ্যরা ১৪৫৭ সালে "চার্চ অব্‌ দি ব্রাদারহুড" বা চলতি কথায় "মরেভিয়ান ভ্রাতৃদল" নামে এক নূতন গোষ্ঠী গঠন করল। দশ বৎসর পরে ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তারা নিউ টেস্টামেণ্টের সরল কৃষিজীবিকা গ্রহণ করল। রিফর্মেশন যুগের ত্রিশ বার্ষিক যুদ্ধে তারা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেল—যে কজন অবশিষ্ট ছিল তারা নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদের কয়েকটি ছোট ছোট শাখা এখনও ইয়োরোপ আফ্রিকা ও আমেরিকার কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

প্রটেস্ট্যাণ্ট বিদ্রোহের আঘাতে চার্চের গৌরব ধূলিসাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর দরিদ্র কৃষাণদের বুকে আশার আলো জ্বলে উঠল। এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল চার্চ ও স্টেট, রাষ্ট্রশাসনে যাজকের প্রভাব ছিল এত ব্যাপক ও গভীর যে একটির ওপর আঘাত সংক্রামিত হল অপরটির ওপর, ধর্মদ্রোহ রাষ্ট্রদ্রোহে উৎক্রান্ত হল। নিউ টেস্টামেণ্ট পড়ে

[৭] উইল ডুরাণ্ট : দি রিফর্মেশন, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭; ১৭০ পৃষ্ঠা। ভ্লাডিমির নোসেক : স্পিরিট অব্‌ বোহেমিয়া, নিউ ইয়র্ক, ১৯২৭। ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা।

শোষিত কৃষাণ জানতে পারল আদিম চার্চের সাম্যবাদের কাহিনী, তার চোখেও লাগল নতুন যুগের মায়া—যখন কারও কোন সম্পত্তি থাকবে না, দুনিয়াটা হবে কৃষাণ মজুরের, চলবে ঈশ্বরের বিধানে। বিপ্লবীরা এই স্বপ্নরাজ্যের মনোরম ছবি এঁকে চাষী মজুরের মধ্যে ছড়াতে লাগল, বঞ্চিতের বুকে জমা হল বারুদের স্তূপ।

১৫২০ সালে পূর্ব স্যাক্‌সনীর জিকাউ-তে প্যাস্টর হয়ে এলেন টমাস মুন্‌ৎসার। সেখানে বাস করতেন নিকোলাস স্টর্শ নামে একজন চার্চদ্রোহী তন্তুবায়। মুন্‌ৎসার তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হলেন। মুন্‌ৎসারের সম্মতিক্রমে স্টর্শ "বোহেমিয় ভ্রাতৃদলের" অনুকরণে এক নয়া চার্চের পত্তন করলেন। শুরু হল রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কার। ক্যাথলিক চার্চ বরদাস্ত করল না—মুন্‌ৎসার ও স্টর্শ জিকাউ থেকে বিতাড়িত হলেন। স্টর্শ লুথারের ঘাঁটি ভিটেনবার্গে গিয়ে প্রচার আরম্ভ করলেন। লুথার তখন অজ্ঞাতবাসে। সনাতনীদের চেয়ে বিপ্লবীরা সংস্কারকের বড় শত্রু। লুথার দেখলেন এদের বাড়তে দিলে তাঁর মত তলিয়ে যাবে। তিনি বেরিয়ে এসে কয়েকটি জোর ভাষণ দিয়ে স্টর্শের আন্দোলন দমন করলেন।

মুন্‌ৎসার পালিয়ে এলেন প্রাগে, সেখান থেকে গিয়ে থুরিঙ্গিয়ার আল্‌স্টেড্‌ নগরে বসলেন এবং এক সাংঘাতিক মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। ঈশ্বরের পথ থেকে যারা বিচ্যুত তাদের বাঁচবার অধিকার নেই, তাদের নিপাত করতে হবে। "তিনি কম্যুনিস্ট মতবাদও পোষণ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন, যে জমিদাররা জলের মাছ, আকাশের পাখি ও মাটির ফসল সমাজকে ভোগ করতে দেয় না তারা চুরি না করার আদেশ লঙ্ঘন করছে।"[৮] তিনি জনতাকে আহ্বান করে বললেন যাজক, রাজন্য ও পুঁজিপতিদের উৎখাত করে এক যৌথ সমাজ স্থাপন কর যেখানে "সমস্ত দ্রব্য সর্বসাধারণের এবং বিলি হবে সময়মত যার যার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে"। আল্‌স্টেড্‌ থেকেও তিনি বহিস্কৃত হলেন—কোথাও আশ্রয় না পেয়ে তিনি দেশে দেশে আগুন ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন।

এ আগুনকে ধরবার জন্যে সমিধ্‌ সঞ্চিত হয়ে ছিল। থুরিঙ্গিয়ার স্বাধীন নগর বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ম্যুলহাউসেন। সেখানে কারখানার মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ জমে উঠেছে। হাইন্‌রিশ ফাইফার নামে এক সন্ন্যাসী মঠ ছেড়ে এসে এখানে বসেছেন। পৌরসভা দখল করবার জন্যে তিনি মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। মুন্‌ৎসার আশপাশের কৃষাণদের নিয়ে জোট বাঁধলেন। মণিকাঞ্চন সংযোগ হল। দুজনে মিলে পৌরসভা থেকে অভিজাত ও যাজকদের তাড়িয়ে স্থাপন করলেন এক "ইটার্ন্যাল কাউন্সিল" বা "শাশ্বত সভা" ম্যুলহাউসেনে প্রবর্তিত হল এক সাম্যবাদী ধর্মতন্ত্র। কিছুদিনের মধ্যে দুই নায়কের মধ্যে মতভেদ হল; মুন্‌ৎসার কয়েক মাইল দূরে ফ্রাঙ্কেনহাউসেন নগরে এসে নিজের মনমত ধর্মরাজ্য গড়তে লাগলেন। ইত্যবসরে হেসি, ব্রান্‌স্‌উইক ও স্যাক্‌সনীর রাজন্যরা একত্র হয়ে নগর অবরোধ করলেন, মুন্‌ৎসারকে বন্দী করে হত্যা করলেন (মে ১৫২৫)। তারপর ম্যুলহাউসেনের পতন হল। ফাইফার ধরা পড়লেন। ধর্মরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনায়কদের জীবনান্ত হল।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহের আগুন সংক্রামিত হল দক্ষিণ জার্মানীতে। স্টুলিঙ্গেন থেকে শুরু করে দিকে দিকে চাষীরা মাথা তুলে দাঁড়াল, জমিদার ও যাজকদের খাজনা বন্ধ করে দিল।

[৮] কেম্ব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রী, খণ্ড ২, দি রিফর্মেশন, ১৯০৭। ১৮৬ পৃষ্ঠা। সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রুধোঁর বিখ্যাত উক্তি কিছু নতুন কথা নয়।

১৫২৫ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রতিনিধিরা মেমিংগেন নগরে সম্মিলিত হয়ে বারো দফা দাবির এক দলিল তৈরী করল।

'প্রথমত আমাদের বিনীত আবেদন ও প্রার্থনা এবং আমাদের ইচ্ছা ও সংকল্পও বটে যে ভবিষ্যতে আমাদের এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে যে গোটা সমাজ মিলিয়া প্যাস্টরকে নির্বাচন ও নিয়োগ করিবে এবং তাহাকে বরখাস্ত করিবার অধিকারও সমাজের থাকিবে।

'দ্বিতীয়ত যেহেতু ওল্ড টেস্টামেণ্টে চার্চের খাজনা বিহিত হইয়াছে এবং নিউ টেস্টামেণ্টে তাহা সমর্থিত হইয়াছে সেহেতু আমরা ন্যায্য পরিমাণ শস্য খাজনা দিব, কিন্তু বিধিসঙ্গতভাবে...আমরা চাই ভবিষ্যতে এ খাজনা সংগ্রহ করিবে সমাজ কর্তৃক নিযুক্ত চার্চের প্রভোস্ট; উহা হইতে প্যাস্টর নিজের এবং পরিবার-বর্গের ভরণপোষণের জন্য একটা সামান্য অংশ পাইবে...বাকিটা সেই গ্রামের অকিঞ্চন ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবে...

তৃতীয়ত এ পর্যন্ত এ প্রথা চলিয়া আসিয়াছে যে আমরা লোকের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইয়াছি, এবং ইহা মর্মান্তিক, কারণ খ্রীষ্ট তাঁহার মূল্যবান রক্ত দিয়া আমাদিগকে মুক্ত ও ক্রয় করিয়াছেন...সুতরাং ইহা শাস্ত্রসম্মত যে আমরা মুক্ত এবং আমরা তাহাই হইব...আমাদের নির্বাচিত ও নিযুক্ত শাসকদের কাছে (আমাদের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত) সকল ন্যায্য ও খ্রীষ্টীয় ব্যাপারে আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত থাকিব, এবং আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে যথার্থ এবং সত্যকার খ্রীষ্টান হিসাবে তাহারা সানন্দে আমাদিগকে ভূমিদাসত্ব হইতে মুক্ত করিবেন অন্যথায় যীশুর বাণী হইতে দেখাইবেন যে আমরা ভূমিদাস...'

অন্য দফাগুলিতে মৃত্যুকর, বেগার খাটনি, জমির অত্যধিক ভাড়া, জমিদার কর্তৃক এজমালি মাঠের বাজেয়াপ্তি ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সর্বশেষ দফায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে যদি শাস্ত্রবচন থেকে দেখান যায় যে দাবিগুলি অসংগত তাহলে প্রত্যেকটি দাবি প্রত্যাহৃত হবে।[৯]

জুরিক থেকে জিংরলির অনুবর্তী প্রটেস্ট্যাণ্টরা এসে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। দলিলের মুসাবিদায় তাঁদের হাত ছিল। লুথারও সনদটিকে সংবর্ধনা করলেন। সঙ্গে তিনি সাবধান করেও দিলেন—আন্দোলন যেন হিংসার পথে না যায়। কিন্তু চাষীরা তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে; পিছন ফিরলে কপালে অসীম নির্যাতন। নরমপন্থী নেতাদের সরিয়ে দিয়ে তারা বিদ্রোহ করল। মোহন্তদের মঠ লুঠ করে, জমিদারদের দুর্গ জ্বালিয়ে দিয়ে, একটির পর একটি শহর দখল করে তারা যাজক-অভিজাতদের জুলুমতন্ত্র উচ্ছেদ করতে লাগল। অনেক জায়গায় কাজকারবার চালাবার জন্যে চাষীসঙ্ঘ বা কমিউন গঠিত হল।

ভূমিদাসদের যে এতবড় স্পর্ধা হতে পারে তা মালিকরা ভাবতে পারেনি। যখন তাদের চৈতন্য হল তারা আর সময় নষ্ট করল না। লুথার ফতোয়া দিলেন বিদ্রোহীদের পশুর মতো হত্যা করবার জন্যে—এ কাজে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্ট-এর এক বিচার, এক কর্তব্য। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জার্মানীতে চাষীর রক্তে মুক্ত সমাজের স্বপ্ন নিমজ্জিত হল।

[৯] মার্টিন লুথার : রচনাবলী, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৪৩। খণ্ড ৪। ২১০-১৬ পৃষ্ঠা।

"খুব কম করে ধরলেও গোটা জার্মানীতে নিহতদের সংখ্যা হবে এক লক্ষ। বিজেতাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি সংযত করতে একটিমাত্র বিবেচনা ছিল—সে হল এই আশঙ্কা যে যদি তারা আত্মসম্বরণ না করে তাহলে তাদের দাসত্ব করবার জন্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। মারগ্রেভ জর্জ ভ্রাতা ক্যাসিমিরকে লিখেছিলেন 'যদি সব চাষীকে মেরে ফেলা হয় তাহলে আমরা আমাদের খাদ্য যোগাবার জন্যে কোথায় আর চাষী পাব?' ক্যাসিমিরকে সতর্ক করবার দরকার ছিল। ভুর্জবার্গ-এর নিকটে কিট্‌জিঙ্গেন-এ তিনি উনষাটজন নগরবাসীর চোখ উপড়েছিলেন এবং অন্য সকলকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়ে এদের চিকিৎসা অথবা অন্য কোন প্রকার সাহায্য দানে নিরস্ত করেছিলেন। যখন চাষীদের বর্বরতার নজির দেখিয়ে ভাইন্‌স্‌বার্গের আঠারজন নাইটের হত্যার কথা বলা হয় তখন-প্রশ্ন করা যেতে পারে জার্মান রাজন্যরা সভ্যতার কোন স্তরে এসে পৌঁছেছিলেন।"[১০]

জার্মানীর কৃষাণ-বিদ্রোহের এক বৎসর আগে সুইজার্ল্যাণ্ডে এনাব্যাপটিস্ট আন্দোলনের অভ্যুদয় হল। আন্দোলনের নামকরণ হয়েছে বিপক্ষদের হাতে। এনাব্যাপটিজ্‌ম্‌ শব্দের অর্থ পুনর্বাপটিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শুদ্ধিকরণ। বস্তুত এনাব্যাপটিস্টরা তা চাইত না। খ্রীষ্টান সন্তানকে শিশুকালে পবিত্র জলে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করার পর থেকে সে হল প্রকৃত খ্রীষ্টান, এই ছিল চলতি প্রথা। এনাব্যাপটিস্টরা মনে করতো এটা একটা অর্থহীন প্রহসন। অবোধ শিশুর শুদ্ধিকরণের কোন মানে হয় না। জন্মেই কেউ খ্রীষ্টান হয় না কিংবা চার্চের এলাকায় আসে না। ধর্মবিশ্বাস গঠিত হলে, পবিত্র জীবনযাপনের অঙ্গীকার করলে তবেই খ্রীষ্টান হওয়া এবং চার্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। শুদ্ধিস্নানের আচার অনুষ্ঠিত হয় এই উপলক্ষে। পরিণত বয়স না হলে খ্রীষ্টান হওয়ার মতো বিচারবুদ্ধি জাগতে পারে না। সুতরাং শুদ্ধি একবারই হয়, সে সাবালক কালে; এনাব্যাপটিস্টরা চাইত সাবালক-শুদ্ধি, পুনঃশুদ্ধি নয়। শিশুদের শুদ্ধি করে চার্চ একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে—এতে প্রবেশ করবার জন্যে জ্ঞান ও বিশ্বাস আবশ্যক হয় না। আসল চার্চ গঠিত হবে অল্পসংখ্যক সাধককে নিয়ে যারা পরিণত বয়সে আত্মার আলোক পেয়ে খ্রীষ্টান হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বিভিন্ন মতাবলম্বী এনাব্যাপটিস্টদের এই হল একমাত্র যোগসূত্র। সনাতন চার্চের কর্তৃত্ব তারা মানল না। ব্যক্তির বিবেকের ওপর চার্চের শাসন চলবে না। আচারে ও বিশ্বাসে ধর্ম হবে নিঃশাসন, বিবেক হবে অবধ্য। এখানে রাষ্ট্রেরও কোন এক্তিয়ার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবে। পুরোহিত কিংবা হাকিম, মঠ-

[১০] কেম্ব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রী, খণ্ড ২, ১৯১ পৃষ্ঠা :

ভাইন্‌স্‌বার্গের হত্যার ব্যাপারটা এই। ১৫২৫ সালের ১৫ই এপ্রিল চাষীরা এই শহর ঘেরাও করে। এখানকার কাউণ্ট ছিলেন একটি অত্যাচারী দানব। চাষীদের একদল প্রতিনিধি তাঁর সংগে দরবার করতে গেল। তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে তিনি হত্যা করলেন। কিছুদিন পরে নগরে ঢুকে চাষীরা চল্লিশজন রক্ষীকে হত্যা করল। কাউণ্ট, তাঁর স্ত্রী ও ষোলজন নাইট বন্দী হলেন। বিদ্রোহী নায়ক রর্বাক দুই সারি চাষীকে বর্শা হাতে দাঁড় করিয়ে হুকুম দিলেন সতেরজন পুরুষ বন্দীকে ওর মাঝ দিয়ে যেতে যেতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কাউণ্ট ও কাউণ্টেস সর্বস্ব দিয়ে কাউণ্টের প্রাণভিক্ষা করলেন। বিদ্রোহীরা শুনল না। বর্শার আঘাতে জর্জরিত কাউণ্টের মৃত্যুর দৃশ্য কাউণ্টেসকে দাঁড় করিয়ে দেখান হল। প্রতিশোধ নেওয়ার পর বিদ্রোহীরা তাঁকে এক মঠে পাঠিয়ে দিল। বেলফোর্ট ব্যাক্‌স্‌ : পেসেণ্ট্‌স্‌ ওয়ার্স এন জার্মানী, লণ্ডন, ১৮৯৯। ১১৮-৩০ পৃষ্ঠা।

মন্দির কিংবা আইন-আদালত—কেউ আত্মা ও ঈশ্বরের মাঝে সালিসি করতে পারে না। একমাত্র মধ্যস্থ হলেন যীশু। অনেকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করত তিনি আবার ফিরে এসে পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন।

এর বাইরে এনাব্যাপটিস্টদের ধ্যান-ধারণা কোন নিশ্চিতি লাভ করতে পারে নি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ছিল নানা মত। কেউ কেউ চার্চ এবং সরকারের অধীনে কোন পদ গ্রহণ না করলেও সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করত না। উগ্রপন্থীরা এরূপ নিষ্ক্রিয় অসহযোগে সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের নৈতিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন সরকারী আইন বা হুকুম কিংবা কোন ধর্মীয় ফতোয়া জারি হলে তা তারা অমান্য করত। যেমন যুদ্ধের ডাক এলে তারা সাড়া দিত না—কারণ যুদ্ধকে তারা পাপ বলে মনে করত। তারা সাক্ষ্য দেবার সমন এলে শপথ নিত না কারণ আদালতের বিচার তাদের কাছে ছিল অবৈধ। তারা সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করত না এবং সমস্ত বিত্ত যৌথভাবে ভোগ করতে চাইত। কেহ কেহ মেয়েদেরও যৌথ বিত্তের পর্যায়ে ফেলত। "অন্যায়কে বাধা দিও না"—যীশুর এই বাণী বীজমন্ত্র করে অনেকে সর্ববিধ বলপ্রয়োগের নীতিকে বর্জন করে চলত। তাদের কাছে সরকারী ও সরকার-বিরোধী উভয়বিধ জবরদস্তি ছিল অন্যায়।[11] পক্ষান্তরে অনেকে কেবল আমলাতন্ত্র, শপথগ্রহণ, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিসম্পত্তি ও শিশুশুদ্ধি বাতিল করে নিষ্ক্রিয় থাকতে প্রস্তুত ছিল না। চার্চ ও রাষ্ট্রের নিগ্রহ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে তারা অস্ত্রধারণ করল। প্রটেস্ট্যান্টদের প্রভাব ছিল প্রধানত জমিদার ও ভদ্র-শ্রেণীর মধ্যে। এনাব্যাপটিস্টরা আসন পাতল ইতর জনের সমাজে। স্বভাবত ইতর লোকের দাবিদাওয়া এদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল, ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের মোড় ফিরল সমাজ বিপ্লবের দিকে। এনাব্যাপটিজ্‌ম্‌-এর উর্বর জমিতে প্রথম সমাজবাদের ফসল ফলল।

১৫২৪ সালে মুনৎসার এবং ওয়াল্ডশাট্‌-এর ব্যাল্‌থাজার হুব্‌মায়ার এসে মিললেন জুরিকের কন্‌রাড গ্রেবেল ও ফেলিক্স্‌ মাঞ্জ-এর সঙ্গে, জুরিকে "ভ্রাতৃদল" নামে প্রথম এনাব্যাপটিস্ট গোষ্ঠী গঠিত হল। এর নৈতিক কার্যক্রম হল সাবালক-শুদ্ধি, খ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাব, চার্চ ও রাষ্ট্রের সংস্রব ত্যাগ এবং সুদ, রাজস্ব, সামরিক কর্তব্য, শপথগ্রহণ ও চার্চের খাজনা বর্জন। এঁদের নেতা গ্রেবেল ছিলেন উচ্চবংশীয়। প্রথমে তিনি জিুংলির শিষ্য ছিলেন। পরে তিনি দেখলেন আসলে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক চার্চে কোন তফাত নেই—দুটিই অনুষ্ঠানসর্বস্ব এবং জাগতিক ব্যাপার নিয়ে লিপ্ত। তিনিই প্রথম আনলেন সাবালক-শুদ্ধি এবং খাঁটি খ্রীষ্টানদের নিয়ে আধ্যাত্মিক চার্চ গড়বার ধারণা। হুব্‌মায়ার ছিলেন বিদ্বান ও সুলেখক। তিনি পনেরটি সুচিন্তিত প্রচারপত্র রচনা করে গেছেন। শিশু-শুদ্ধির খণ্ডনে লেখা "দি খ্রীশ্চিয়ান ব্যাপটিজ্‌ম্‌ অব বিলীভার্স" (১৫২৫) এর মধ্যে অন্যতম এবং প্রচারের দিক দিয়ে সবচেয়ে সার্থক। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে অকাট্য যুক্তির অবতারণা তিনিই প্রথম করেছেন। সম্পত্তির যৌথকরণে তাঁর মত ছিল না, ব্যক্তির অবাধ অধিকারও তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন ধনীর উচিত দরিদ্রের সঙ্গে ধন ভাগ করে নেওয়া কারণ তারা বস্তুত সম্পত্তির মালিক নয়, রক্ষক মাত্র।

লুথারের মত জিুংলিও দেখলেন এ আন্দোলন অরাজকতা আনবে, উচ্ছৃঙ্খলতায় ধর্মকর্ম সব ভেসে যাবে। জুরিকের কাউন্সিলে তিনি নগর থেকে এদের বহিষ্কার করবার

[11] এরা টলস্টয়ের দর্শনের মুখবন্ধ রচনা করে গেছেন।

এক আদেশনামা পাস করালেন। কৃষাণ-বিদ্রোহের ব্যর্থতা পারিষদদের সাহস বাড়িয়ে দিল। তারা মাঞ্জ, গ্রেবেল ও হুব্‌মায়ারকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করল। তাঁদের খাবার জন্যে বরাদ্দ হল শুধু রুটি ও জল 'যাতে ঐখানে তারা মরে পচে।' গ্রেবেল সেভাবেই প্রাণ দিলেন (১৫২৬)। মাঞ্জ (১৫২৭) এবং হুব্‌মায়ারের স্ত্রীকে (১৫২৮) তারা জলে ডুবিয়ে মারল। কন্‌স্‌ট্যান্স-এ হাটসের নামে এই গোষ্ঠীর আর একজন শির দিলেন কিন্তু শির নোয়ালেন না। ব্লাউরক নামে অপর একজনকে পথে পথে বেত্রাঘাত করে নির্বাসন দেওয়া হল। হুব্‌মায়ার মত প্রত্যাহার করে মুক্তি পেলেন, প্রত্যাহারকে আবার প্রত্যাহার করলেন এবং প্রচার করতে গেলেন অগ্‌স্‌বার্গ ও মরেভিয়া। অনুসৃত পশুর মত স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি লিক্‌টেন্‌স্টাইনের লর্ডদের কৃপায় নিকল্‌স্‌বার্গে আশ্রয় পেলেন। অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও সুইজার্ল্যাণ্ডের নানান জায়গা থেকে পলাতক ও নির্বাসিতরা এখানে এসে জড় হতে লাগল। অস্ট্রিয়ার সরকার জানতে পেরে লর্ডদের আদেশ দিল ধর্মদ্রোহী দেশদ্রোহী হুব্‌মায়ারকে সমর্পণ করবার জন্যে। লর্ডরা আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহস পেলেন না। আট মাস কারাগারে আবদ্ধ রাখার পর ভিয়েনার সরকার হুব্‌মায়ারকে পুড়িয়ে মারল (মার্চ ১৫২৮)।

এর আগেই আন্দোলন দক্ষিণ জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অগ্‌স্‌বার্গ, টাইরল ও স্ট্রাসবুর্গ হুব্‌মায়ার ও হান্স ডেন্ক-এর প্রচারে মেতে উঠেছিল। ১৫২৮ সালে সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌স্‌ পুনঃশুদ্ধির অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়ে এক ফতোয়া জারি করলেন। পর বৎসর স্পেয়ারের ডায়েটে এই ফতোয়া সমর্থিত হল। ১৫৩০ সালে অগ্‌স্‌বার্গের ডায়েটে প্রটেস্ট্যান্টরাও আন্দোলনকে রুখবার জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করল।

এর পর যে নিরঙ্কুশ বর্বরতার তাণ্ডব শুরু হল তা অবর্ণনীয়। সিবাস্‌শিয়ান ফ্রাঙ্ক নামে একজন সমসাময়িক নিরপেক্ষ লেখক মন্তব্য করেছেন যে ১৫৩০ সালের মধ্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল দু হাজার লোক। "যাদের বিশ্বাস ছিল শিথিল তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত প্রত্যাহার করান হল তারপর তাদের মুণ্ডপাত করে আগুনে পোড়ান হল। যারা মত প্রত্যাহার করল না তাদের জীবন্ত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হল।... অন্যান্য জায়গায় যে ঘরে তারা সর্বদা সভা করত এবং পরস্পরে ভাব বিনিময় করত সেই ঘরে তাদের পুরে দড়ি দিয়ে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল।...একটি ষোল বছরের সুন্দরী মেয়েকে কিছুতেই মত প্রত্যাহার করান গেল না;...যে অপরাধে সে অভিযুক্ত হয়েছিল তাতে সে অপরাধী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে মনে প্রাণে ও চেহারায় সে ছিল নিষ্পাপ নির্দোষ। প্রত্যেকে তার হয়ে জীবন ভিক্ষা করল। ঘাতক তাকে বাহুতে তুলে নিকটে একটি ঘোড়ার জলের চৌবাচ্চায় নিয়ে গেল এবং তাকে জলের নীচে চেপে ধরল যতক্ষণ না দম বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়; তারপর প্রাণহীন দেহটি বার করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল।"[12]

হল্যাণ্ডে এনাব্যাপটিস্ট গোষ্ঠীর স্রষ্টা মেল্‌শিয়র হফম্যান। তিনি ছিলেন অশিক্ষিত, এক পশম-ব্যবসায়ীর কর্মচারী। কিন্তু বাইবেল-এর বিদ্যা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। প্রথমে তিনি ছিলেন লুথারের ভক্ত। ক্রমে মতভেদ উপস্থিত হল। ১৫২৯ সালে তিনি স্ট্রাসবুর্গে এসে এনাব্যাপটিস্টদের দ্বারা পরিশুদ্ধ হলেন। তারপর তিনি হল্যাণ্ডে গিয়ে প্রচার শুরু করলেন যে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ১৫৩৩ সালে স্ট্রাসবুর্গে অবতরণ করে নিজ হাতে শাসনদণ্ড গ্রহণ

[12] লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কে : হিস্ট্রী অব দি রিফর্মেশন ইন জার্মানী। অনুবাদ, সারা অস্টিন। লণ্ডন, ১৯০৫; ৭২৯-৩০ পৃষ্ঠা।

করবেন। এই 'নয়া জেরুজালেমে' তাঁর নিজের ভূমিকা হবে প্রফেট ইলায়াসের মত। প্রভুর আবির্ভাবের আয়োজন করবার জন্যে তিনি স্ট্রাসবুর্গে এলেন। সেখানে যাঁশুর অগ্রদূত গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। দশ বৎসর পরে বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল।

আন্দোলন হত্যা ও নির্যাতনে প্রশমিত হল না বরং উত্তর ও পূর্ব জার্মানীতে প্রসারিত হল। হুট নামে মুনৎসারের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত একজন চরমপন্থী ব্যক্তি-সম্পত্তিকে আঘাত করলেন, হুবমায়ারের প্রভাব থেকে মরোভিয়াকে মুক্ত করে সেখানে যৌথ সম্পত্তির আদর্শ প্রচার করলেন। তিনি এবং তাঁর অনুচরেরা অস্টারলিজ্-এ একটি কমিউনিস্ট আশ্রম স্থাপন করলেন। সেখানে চাষ-আবাদ হত সামুদায়িক ভাবে। কৃষি ও কারুশিল্পের উপকরণ সমাজের কর্মচারীরা কিনে বিলি করত। আয়ের কিছু অংশ জমিদারকে ভাড়া দেওয়া হত, বাকিটা প্রয়োজন অনুসারে সকলকে ভাগ করে দেওয়া হত। যৌথ সমাজের অঙ্গ ছিল পরিবার নয়—চারশ থেকে দু হাজার পর্যন্ত লোক নিয়ে এক এক আবাসঘর, যাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল এক এক রান্নাঘর, ধোপাখানা, স্কুল, হাসপাতাল ও পানশালা। মায়ের দুধ ছাড়বার পর শিশুরা একসঙ্গে প্রতিপালিত হত, কিন্তু এক বিবাহের প্রথা পরিত্যক্ত হয় নি।[১৩] ত্রিশ বার্ষিক যুদ্ধের সময়ে সম্রাটের এক ফতোয়ায় (১৬২২) এই সমাজটি উৎসন্ন হল। এর সভ্যদের বাধ্য করা হল ক্যাথলিক ধর্ম কিংবা নির্বাসন দুটোর একটা বেছে নিতে। যারা নতি স্বীকার করল না তারা কেউ গেল রুশে, কেউ বা হাঙ্গারীতে।

যারা বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে রাজী ছিল না তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল,—হয় অত্যাচার সহ্য করতে করতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, নয় তা স্বধর্ম রক্ষার জন্যে প্রত্যাঘাত করা। জন ম্যাথিস নামে হারলেমের এক রুটিওলা, হফ্ম্যানের মন্ত্রশিষ্য দ্বিতীয় পথটি বেছে নিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে ধীরভাবে অপেক্ষা করে 'নয়া জেরুজালেম' পাওয়া যাবে না; তাকে জোর করে আনতে হবে। তিনি নিজে আসন্ন ধর্মযুদ্ধের এনক হয়ে বসলেন এবং প্রতিবেশী প্রদেশগুলোকে দীক্ষিত করবার জন্যে বারোজন ধর্মদূত পাঠালেন। এর মধ্যে ছিলেন জ্যান বকেলসন নামে লেডেনের এক তরুণবয়স্ক দর্জি। পরে তিনি জন অব লেডেন নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ, সুবক্তা, দুঃসাহসী ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালী। মুনৎসারের লেখা পড়ে তাঁর বিশ্বাস জন্মাল। চাঁত্রিশ বছর বয়সে ম্যাথিসের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি ওয়েস্টফেলিয়ার সমৃদ্ধিশালী জনবহুল রাজধানী মুনস্টারে ধর্মপ্রচার করতে গেলেন।

মুনস্টার ছিল চার্চের অধীন, একাধারে এর লর্ড ও বিশপ ছিলেন ফ্রাঞ্জ ফন্ ওয়াল্ডেক। কিন্তু ধর্মকর্মের বদলে এখানে গড়ে উঠেছিল শিল্প ও বাণিজ্য। নগরের কাজ চালাত একটি নির্বাচিত পৌরসভা, তাতে ছিল ধনিক শ্রেণীর প্রাধান্য। কৃষাণ-বিদ্রোহের পর থেকে এখানে শ্রমিক শ্রেণী মাথা তুলতে লাগল। এদের নেতৃত্ব নিলেন লুথারের প্রাক্তন চেলা প্যাস্টর বার্নহার্ড রথম্যান। তিনি ওলন্দাজ এনাব্যাপটিস্টদের সাহায্য চাইলেন। প্রথমে এলেন জন অব লেডেন, তারপর ম্যাথিস নিজে। তিনজন মিলে বিশপের ফৌজকে বিতাড়িত করে নগর দখল করলেন। নির্বাচনের ব্যবস্থা হল। এনাব্যাপটিস্টরা পৌরসভা করায়ত্ত করল। পরম উল্লাসের মধ্যে বিপ্লবীরা ঘোষণা করল বহুদিনের স্বপ্নসাধ ঈশ্বরের রাজ্য বা

[১৩] উইল দুরান্ট : দি রিফর্মেশন, ৩১৮ পৃষ্ঠা। বর্তমানে ইস্রায়েলে ঠিক এই ভিনিসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সেখানকার কিবুৎসগুলি ৪০০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত চাষী অথবা চাষীকারিগরের এক একটি গোষ্ঠী। তারা বাস করে একসঙ্গে এবং তাদের শিশুরাও বাপ-মার কাছে থাকে না।

নয়া জেরুজালেমের প্রতিষ্ঠা (১৫৩৪)।

এদিকে বিশপ হেসির রাজন্য ফিলিপের সাহায্য নিয়ে নগর অবরোধ করলেন। আশঙ্কা হল জার্মানীর অন্যান্য রাজন্যও তাঁর সাহায্যে আসবেন। পৌরসভা সুদীর্ঘ অবরোধের জন্যে প্রস্তুত হল। অবিশ্বাসীদের তারা নগর ছেড়ে যেতে বাধ্য করল। তারপর পৌরসভাকে সরিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিল এক জনরক্ষা সমিতি। ম্যাথিস শত্রুর ব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। জন অব লেডেন হলেন সর্বাধিনায়ক। তাঁর নির্দেশে প্রবর্তিত হল এক সমাজবাদী ধর্মরাজ্য। যুদ্ধের প্রয়োজনে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার খর্ব করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হল, আর নয়া জেরুজালেমকে রক্ষা করবার জন্যে জাগিয়ে তোলা হল ধর্মের উন্মাদনা। জন অব লেডেন হলেন 'ইস্রায়েলের রাজা' আর জনরক্ষা সমিতির সভ্যরা খেতাব নিলেন 'ইস্রায়েলের দ্বাদশ যূথের জ্যেষ্ঠমণ্ডলী'।

মুনস্টারের এই নয়া জেরুজালেম সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হয়েছে। অনেকে কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এরা আইন, আমলা, সম্পত্তি ও বিবাহ তুলে দিয়ে অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়েছিল। পুরাতন আইন ও আমলাতন্ত্র বাতিল হয়েছিল সন্দেহ নেই। সম্পত্তির ওপর মালিকের অধিকার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল বটে তা বলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়নি। নির্ধনদের অন্নবস্ত্র যোগাবার জন্যে তিনজন ডীকন নিযুক্ত হয়েছিল; আর ধনিকদের বাধ্য করা হয়েছিল তাদের উদ্বৃত্ত ধন সাধারণের জন্যে দান করতে। নগরের ভিতরকার চাষের জমি পারিবারিক লোকসংখ্যার অনুপাতে পরিমাপ করে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কেবল মণিমুক্তা, সোনারুপা ও যুদ্ধের লুণ্ঠনের সামগ্রী আসত যৌথ ভাণ্ডারে।[১৪]

কামাচার ও ব্যভিচারের স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নেই। মাতলামি ও জুয়া খেলার শাস্তি ছিল কঠিন। বেশ্যাবৃত্তি ও ব্যভিচারের দণ্ড ছিল মৃত্যু। তবে অনেক সমর্থ পুরুষ পালিয়ে যাওয়ার ফলে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে একটা যৌন সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়। জনরক্ষা সমিতি বাইবেল-এর নজির দেখিয়ে আদেশ জারি করলেন বেওয়ারিশ মেয়েরা হবে 'এয়োস্ত্রীদের সঙ্গিনী'—অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষদের রক্ষিতা ও ভোগ্যা। সম্ভবত অধিকাংশ নারী নিঃসঙ্গ ও নিঃসন্তান জীবন যাপনের চেয়ে এই অবস্থাকে খারাপ মনে করেনি। সবাই এই বৈপ্লবিক সংস্কারকে গ্রহণ করতে পারল না। রক্ষণশীলরা বিদ্রোহ করে রাজ্যকে বন্দী করল। কিন্তু অনতিবিলম্বে তারা রাজভক্তদের হাতে পরাস্ত ও ধ্বংস হল। জন নিষ্কণ্টক হয়ে নিজেই বহু বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর আর যাই দোষ থাকুক তাঁর শাসন যে জনপ্রিয় ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাজার হাজার লোক তাঁর আদেশে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল এবং এদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারী ও বালকের সংখ্যা ছিল বেশী। নগররক্ষায় নারীদের অবদান ছিল অমূল্য। অত্যাচারী ও ব্যভিচারী বলে জনের যতই দুর্নাম রটুক না কেন 'ইস্রায়েলের রাজা'র ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের গুণে অবিসংবাদিত।

নগর ঘিরে যতই অবরোধের ফাঁস আঁট হতে লাগল ততই সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে লাগল রাজার মুঠোয়। একতন্ত্রের সমর্থনে রাজা ও পারিষদরা এনাব্যাপটিস্ট ধর্ম-বিশ্বাসের নূতন টিকা রচনা করলেন। যাঁশুখ্রীষ্টের রাজ্য তো লৌকিক নয় আধ্যাত্মিক,

[১৪] কার্ল কাউট্স্কী : কমিউনিজম্ ইন সেন্ট্রাল ইয়োরোপ। ২৬০ পৃষ্ঠা।

তার নির্ভর অস্ত্র ও শাসনের ওপর নয়, আত্মার শুদ্ধির ওপর,—এই সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যে তাঁরা এক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের অভ্যুদয় হবে দুঃখ দুর্দশার ঘনঘটার মধ্যে,—তার অবসানে পৃথিবীতে আসবে যীশুর রাজ্য আনন্দে সমুজ্জ্বল ও গৌরবে সমুজ্জ্বল যা তিনি বিশ্বস্ত শিষ্যদের নিয়ে সহস্র বর্ষ ধরে উপভোগ করবেন। এই সহস্রবার্ষিক স্বর্ণযুগের পূর্বাহ্নে মুনস্টার রাজ্যকে দুঃখবরণ করতে হবে। এই অবরোধ ঈশ্বরের পরীক্ষা,—এ থেকে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করবার আগে মরুভূমির পথে হিব্রু যাত্রীদের কত ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছিল কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল! প্রফেটরা কি একজন রাজচক্রবর্তীর আগমন বার্তা ঘোষণা করেন নি?[১৩] এই নব্য দর্শনের বলে 'ইস্রেলের রাজা' হলেন 'সারা বিশ্বের সম্রাট', সাজসজ্জায় চালচলনে আনলেন চোখ-ধাঁধানো জৌলুষ ও জাঁকজমক। অবিরাম লোকদেখানো সমারোহের আবর্তে পড়ে সম্রাটের মাথা ঘুরে গেল। ক্ষমতার মোহে সকল দেশে সকল যুগে স্বৈরাচারীর যা হয়, সেই অমোঘ ঐতিহাসিক পরিণাম নেমে এল 'বিশ্বপতি' জন অব লেডেনের ওপর।

এদিকে মুনস্টারের তরঙ্গ নগরের প্রাচীর ডিঙিয়ে সারা জার্মানীতে আলোড়ন তুলল। শাসকদল সচকিত হল। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্টরা হাত মিলিয়ে শক্তি সমাবেশ করল। ১৫৩৫ সালের এপ্রিল মাসে মুনস্টার অবরোধের ব্যয় নির্বাহের জন্যে সমস্ত জার্মানীর ওপর একটি কর ধার্য হল। বিশপ ওয়ালডেক নগরে রসদ প্রবেশ করবার সমস্ত ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিলেন। দুর্ভিক্ষ আসন্ন দেখে জন নির্দেশ দিলেন যাদের ইচ্ছা হয় তারা নগর ছেড়ে চলে যাক। অনেকে এই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করল এবং বিশপের সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারাল। এদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে নগরে প্রবেশ করবার একটা সহজ রাস্তা দেখিয়ে দিল। এই পথে বিশপের ফৌজ এসে অনশনক্লিষ্ট নগররক্ষীদের ওপর চড়াও হল। তাদের আর আত্মরক্ষা করবার সামর্থ্য ছিল না। নগর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার আশ্বাস পেয়ে তারা আত্মসমর্পণ করল (জুন ১৫৩৫)। অস্ত্র ত্যাগ করা মাত্র তাদেরকে সদলবলে হত্যা করা হল। ঘরে ঘরে তল্লাশ করে বিজেতারা অবশিষ্ট চারশতজন পলাতককে বার করে এনে বধ করল। জন অব লেডেন ও তাঁর দুইজন সহকারীকে ধরে এনে তারা বধ্যভূমিতে দণ্ডের সঙ্গে আবদ্ধ করল, গরম সাঁড়াশি দিয়ে টেনে টেনে তাদের দেহের মাংস ছিঁড়ল। পোড়া মাংসের দুর্গন্ধ যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন তারা তাদের জিভ টেনে উপড়ে ফেলল। অবশেষে ঘাতক তাদের বুকে ছোরা বসিয়ে শেষকৃত্য সমাপন করল।

লুথারের অঙ্গুলিসংকেতে জার্মানীর ওপর এক করাল বিভীষিকার অগ্নিপাত হল। ধর্মদ্রোহীদের মধ্যে যারা ছিল সংগ্রামশীল ও অটলবিশ্বাসী তারা নিহত অথবা নির্বাসিত হল। যারা ছিল শান্তিপ্রিয় তাদেরও নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার সীমা রইল না। অনেকে মত প্রত্যাহার করল। কেহ কেহ ক্যাথলিক চার্চে যোগ দিল। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তারা ছোট ছোট মিস্টিক সম্প্রদায় গঠন করে শান্ত হয়ে বসল। স্বর্ণযুগের সাম্যবাদ ও নৈরাজ্যবাদকে যীশুর জন্যে তুলে রেখে, চার্চ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে তারা ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করল। মেন্নো সাইমন্স্ নামে এদের একজন আশাহত বিশ্বাসীদের দলবদ্ধ করে নূতন পথে পরিচালনা করলেন। যীশুখৃষ্ট নিজে নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকারী

[১৩] লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কে : হিস্ট্রী অব দি রিফর্মেশন ইন জার্মানী, ৭৪৪ পৃষ্ঠা।

আদেশ শিরোধার্য করতে। মেন্নোনাইট সম্প্রদায় বিদ্রোহের নীতি বর্জন করে বাধ্যতার নীতি গ্রহণ করল। হল্যান্ড ও রুশে গিয়ে এরা চাষ আবাদ নিয়ে বসল। এদের যৌথ খামারগুলি ছিল দেখবার মত। ১৮৭৪ সালে এদের একদল আমেরিকার দক্ষিণ ডাকোটায় বসতি স্থাপন করল। এখনও সেখানে এরা শ্রেণীহীন গোষ্ঠীজীবন রক্ষা করে চলেছে। এরূপ আর একটি সম্প্রদায় আছে হুটেরাইট ভ্রাতৃদল নামে। এদের গুরু জেকব হুটের ছিলেন সুইস্ এনাব্যাপটিস্ট। ১৫৩৬ সালে ইন্স্ব্রুকে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। এরা গিয়ে বসল উক্রেন, ক্যানাডা ও স্পেনে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এনাব্যাপটিস্ট ঐতিহ্য বহন করল ইংলণ্ডের যুদ্ধ-বিরোধী কোয়েকাররা আর আমেরিকার সাবালক-শুদ্ধিতে আস্থাবান ব্যাপটিস্টরা।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় পাদে মধ্য ইয়োরোপ জুড়ে যে ঝড় উঠেছিল তাতে অনেক বিপ্লবী চিন্তানায়কের নাম হারিয়ে গেছে। এদের মধ্যে একজন দক্ষিণ জার্মানীর সিবাস্‌শিয়ান ফ্রাঙ্ক (১৪৯৯-১৫৪৩)। তিনি স্ট্র্যাসবুর্গে এসে বসবাস করছিলেন। হিউম্যানিস্ট নেতা ইরাসমাসের উদ্যোগে ১৫৩২ সালে তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ছিলেন মিস্টিক মানবপ্রেমিক—সব রকম চার্চ বা সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী। এনাব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়কেও তিনি বাদ দেননি। যীশুর শিষ্য এপস্‌ল্‌দের পর থেকে চার্চ খৃষ্টবিরোধী কার্যকলাপে কলুষিত হয়েছে—একে রসাতলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তুর্ক ও হীদেনদের মধ্যে মত ও বিশ্বাসের যেটুকু স্বাধীনতা আছে লুথারের চার্চে তাও নেই। সম্প্রদায় গড়তে গেলেই স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিতে হয়। আসল চার্চ অদৃশ্য অবাস্তব, বিশ্বাসী খৃষ্টানদের আধ্যাত্মিক মিলনতীর্থ, সেখানে ভক্তকে পথ দেখায় অন্তরোত্থিত ঈশ্বরের বাণী। সিবাসশিয়ানের উল্লেখযোগ্য রচনা "ক্রনিকা" (১৫৩১) বাইব্‌ল্‌-এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা ইতিহাস এবং "প্যারাডক্সা" (১৫৩৪) স্বাধীন চিন্তার পাঠ। তাঁর চার্চ-বিরোধী তীব্র মন্তব্যগুলি প্রজ্ঞানযুগের ভলতেরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে এনাব্যাপটিস্টরা ছিল নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়, সমসাময়িক নৈতিক মানের তুলনায় চরিত্রবান। কিছু কিছু লোকের ও কোন কোন গোষ্ঠীর পাগলামি ও বাড়াবাড়ির জন্যে সমস্ত আন্দোলনের ওপর কলঙ্ক পড়েছে। এনাব্যাপটিস্টদের মারাত্মক দুর্বলতা ছিল একতার অভাব। সিবাসশিয়ান ফ্রাঙ্ক বলেছেন এমন দুটি গোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা সব বিষয়ে একমত। এদের মধ্যে এমন কোন চিন্তানায়কের উদ্ভব হয়নি যাঁর হাতে অসংলগ্ন নীতি ও বিশ্বাসগুলি একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শনে উত্তীর্ণ হতে পারত। ফলে বিশৃঙ্খল ভাবনার সঙ্গে অন্তরের বাণী ও দিব্যদৃষ্টি তালগোল পাকিয়ে কতকগুলি উদ্ভট বিশ্বাসের সৃষ্টি হল। ধর্মান্ধতার পিছনে যখন অস্ত্র ও সংঘশক্তি এসে দাঁড়াল তখন প্রস্তুত হল সর্বনাশের রাস্তা। ক্ষমতার পেছনে পেছনে এল আত্মকলহ—মতভেদগুলো প্রকট হয়ে উঠল। সম্পত্তির যৌথকরণ, যীশুর পুনরাবির্ভাব, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর ওপর ছিল বিপরীত মত। ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে এনাব্যাপটিস্টরা ছিল চরম ব্যক্তিত্বপরায়ণ। রাষ্ট্রশাসনকে সরিয়ে বিকল্প ব্যবস্থার পত্তন করতে হলে যে সমাজবোধ ও যৌথসত্তার প্রয়োজন এনাব্যাপটিস্টদের চিন্তায় ও সংগঠনে সে জিনিস ছিল না।

তত্ত্বের দিক দিয়ে এনাব্যাপটিস্টরা নৈরাজ্যবাদী নয়। তারা রাষ্ট্রকে বিনাশ করতে চায়নি, যদিও মুন্স্টারের বিপ্লবীরা এর অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাটাই করে দিয়েছিল। সেনেকা ও যীশুর মত তারা মনে করত যে রাষ্ট্র মন্দ লোকের শাসনের জন্যে একটা অপরিহার্য অন্যায় বস্তু—যার সঙ্গে সৎ লোক বা খাঁটি খৃষ্টানদের কোন সম্পর্ক নেই। এনাব্যাপটিস্টরা

আমলাতন্ত্র ভাঙতে যায়নি। তাদের বিবেক সায় না দিলেই তবে তারা আমলাদের নির্দেশ অমান্য করত। তারা সরকারী কাজ নিত না কারণ এ প্রকার পদগৌরব খ্রীষ্টান ভ্রাতৃসম্বন্ধের পরিপন্থী। তারা প্রাণদন্ডের বিরোধী ছিল কারণ মানুষের জীবন তাদের কাছে ছিল মূল্যবান এবং প্রাণদণ্ডে অপরাধ দূর হয় এ তারা বিশ্বাস করত না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল একই কারণে। যুদ্ধের হত্যাকান্ড খ্রীষ্টান জনোচিত নয় এবং এতে কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তারা শপথ নিত না কারণ এটা অন্তরের জিনিস। আনুষ্ঠানিক শপথের কোন মূল্য নেই। জোর করে নেওয়ান শপথে কেউ বাধ্য থাকে না—তাতে শুধু ভন্ডামি প্রশ্রয় পায়।

যদিও এনাব্যাপটিস্টরা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে চায়নি তবুও এদের আপত্তিগুলো যে কোন রাষ্ট্রকে অচল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আমলাতন্ত্র, দন্ডবিধি, শপথের ওপর নির্ভরতা এগুলি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বাদ দিয়ে কোন রাষ্ট্র বৈষ্ণব হয়ে বসতে পারে না। সর্বোপরি যে রাষ্ট্রের জন্ম পাপে, যার দেহে পাপের ছাপ তার মর্যাদা কোথায়? যদি রাজকার্য সৎ খ্রীষ্টানের অযোগ্য হয়, যদি কেবল অসৎ লোকের জন্যে থাকে এ কাজ, তাহলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এ রাষ্ট্রকৃত্যই বা থাকবে কোথায়? বরং দুষ্ট লোকের হাতে রাজধর্ম হবে এর বিপরীত। সুতরাং এনাব্যাপটিস্টরা রাষ্ট্রকে সরাসরি বিলোপ করতে না চাইলেও তাদের মতগুলি রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক।

সনাতনীদের অত্যাচারে ধর্মদ্রোহীরা হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। যে ঈশ্বরের রাজ্য ছিল অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, তা যখন হিংসার পথে মর্তলোকে নেমে এল তখন তার সঙ্গে আর সনাতনীদের চার্চের সঙ্গে কোন মৌলিক পার্থক্য রইল না। যেমন কেলভিনের জেনেভা ছিল ঈশ্বরের নগরী, খ্রীষ্টান সাধুদের তীর্থস্থান, কঠোর ধর্মীয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত, যেখানে বিরুদ্ধবাদীদের ধরে পুড়িয়ে মারা হত, বিপ্লবীদের স্বপ্নরাজ্য নব জেরুজালেম কায়েম হলে তার চেহারাও অন্যরকম হত না। সনাতন ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে গিয়ে এনাব্যাপটিস্টরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতই জুলুম ও জবরদস্তির জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল, যে হিংসা ও বলপ্রয়োগ ছিল তাদের নীতিবিরুদ্ধ তার আবর্তে পড়ে আন্দোলন নীতিভ্রষ্ট হল।

রাষ্ট্রের ন্যায় ব্যক্তিসম্পত্তি সম্বন্ধেও তাদের মনে দ্বিধা ও সংশয় ছিল। কারও কারও সাম্যবাদের আদর্শ ছিল যীশুর শিষ্যদের আমলের আদিম চার্চ, যেখানে উপার্জক স্বেচ্ছায় সকলের হিতার্থে বিত্ত সমর্পণ করত। মরেভিয়াতে এনাব্যাপটিস্টদের এরূপ অনেক যৌথ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। অস্টারলিজেও ছিল কৃষি গোপালন ও কারুশিল্পে পারদর্শী হুটপন্থীদের প্রকান্ড কমিউন,—মুন্‌স্টারের পতনের পর এগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। অনেকের সাম্যবাদ ছিল আরো উগ্র,—যার ভিত্তি খ্রীষ্টানজনোচিত প্রেমধর্মে নয়, মানুষের স্বাভাবিক মৌলিক অধিকারে। তাদের সমাজতন্ত্র ছিল বাধ্যতামূলক যেখানে সকলের বিত্ত সমাজ করায়ত্ত করেছে—কারও অনুগ্রহের দানের ওপর সে নির্ভর করে না। সকলে আবার এই চরমপন্থা পছন্দ করত না। অনেকে সম্পত্তিকে ঈশ্বরের ট্রাস্ট বা ন্যাস বলে গণ্য করত। মালিক বস্তুত সম্পত্তির ন্যাসপাল;—সম্পত্তি জনকল্যাণে ব্যবহৃত হবে ঈশ্বর মালিককে এই শর্তে আবদ্ধ করেছেন।

অনেক এনাব্যাপটিস্ট ছিল তেজারতি কারবারের বিরোধী। যেহেতু কেউ সম্পত্তির মালিক নয়, সেহেতু টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া অন্যায়। টাকা ধার দেওয়া উচিত লাভের

জন্যে নয়, ঋণীকে সাহায্য করবার জন্যে। কারও অভাবের সুযোগ নিয়ে লাভ করা অতি নীচ কাজ। অনেকে চার্চকে খাজনা দিতে গররাজী ছিল। যার তার কাছ থেকে আদায় করা টাকায় ধর্ম রক্ষা হয় না। ধার্মিকরা স্বেচ্ছায় যা দেয় তা দিয়েই ধর্মাচরণ সম্ভব।

এনাব্যাপটিস্টদের ক্রান্তিযজ্ঞ রক্তগঙ্গায় ডুবে গেলেও তাদের সাধনা নিষ্ফল হয়নি। তাদের একাধিক নীতি আজকের সমাজ মঞ্জুর করে নিয়েছে। বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতা আধুনিক লোকায়ত রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। প্রাণদন্ড অনেক দেশের দন্ডবিধিতে আজ আর নেই। যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি-আন্দোলন আজ আর কল্পনাবিলাসী বায়ুগ্রস্তদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিন্তু নৈরাজ্যবাদ ও সাম্যবাদ আজও দূর দূরান্তে—মুষ্টিমেয় স্বপ্নচারীর ধ্যানলোক থেকে তা মরলোকে অবতরণ করল না।

অচেনা

আলবেয়ার কাম্যু

কিন্তু আর বলে লাভ নেই। লোকটা তখন রেমণ্ডের হাতে ও মুখে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে।

ম্যাসন লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। জলের মধ্যে যে বসেছিল সেই আরবটা উঠে পড়ে ছুরি যার হাতে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমরা আর এগুতে তখন সাহস পাচ্ছি না। লোক দুটো ছুরি দেখিয়ে শাসিয়ে একটু একটু করে আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখে পেছুতে লাগল। এইভাবে বেশ কিছুদূরে গিয়ে পেছন ফিরে দে দৌড়। আমরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথার ওপর আমাদের কড়া রোদ।

রেমণ্ডের হাত থেকে রক্ত পড়ছে। কনুই-এর ওপরটা সে সজোরে চেপে ধরে আছে।

ম্যাসন বললে কাছাকাছি একজন ডাক্তারকে হয়ত পাওয়া যেতে পারে। প্রতি রবিবার তিনি নাকি এইখানেই কাটান।

বেশ তাঁর কাছেই চল এখুনি—বললে রেমণ্ড। ভালো করে সে কথাই বলতে পারছিল না। মুখের কাটাটা থেকে রক্তের বুদ্বুদ বার হচ্ছিল।

দুজনে দুদিক থেকে ধরে তাকে বাংলোতে নিয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছোবার পর তেমন বেশী কিছু কাটেনি জানিয়ে সে নিজে হেঁটেই ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে বললে। মারীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে আর ম্যাসনের স্ত্রী তো কাঁদতে শুরু করেছেন।

ম্যাসন আর রেমণ্ড ডাক্তারের কাছে চলে গেল। ব্যাপারটা মেয়েদের কাছে বুঝিয়ে বলবার জন্যে আমায় থাকতে হল। কাজটা আমার পক্ষে রুচিকর নয়। খানিক বাদেই চুপ করে গিয়ে আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সিগারেট খেতে শুরু করলাম।

প্রায় দেড়টা নাগাদ রেমণ্ড ম্যাসনের সঙ্গে ফিরে এল। তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ঠোঁটের কাটার ওপর একটা পটি। ডাক্তার তাকে জানিয়েছে যে ব্যাপারটা ভয়ের কিছু নয়, কিন্তু মুখখানা তার তবু বেশ ভার ভার। ম্যাসন তাকে হাসাবার চেষ্টা করলে কবার, কিন্তু তাতে ফল কিছু হল না।

খানিকবাদে রেমণ্ড সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতে চাইলে। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যেতে চায়।

"হাওয়া খেতে চাই" গোছের কি যেন সে বিড় বিড় করে বললে।

ম্যাসন আর আমি তার সঙ্গে যেতে চাইলাম, কিন্তু সে রেগে উঠে আমাদের নিজের চরকায় তেল দিতে বললে।

তার মেজাজ বুঝে ম্যাসন আর পেড়াপিড়ি করা উচিত মনে করলে না। রেমণ্ড বেরিয়ে যাবার পর আমি তার পিছু পিছু গেলাম।

বাইরে যেন আগুনের হলকা উঠছে। বালি আর সমুদ্রের জলে প্রচণ্ড রোদ যেন আগুনের কুচি হয়ে হয়ে ফেটে পড়ছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাঁটলাম। রেমণ্ড কোথায় যাবে ঠিক করেই বেরিয়েছে আমার মনে হল। হয়তো আমার অনুমান ভুল।

বালির চড়া যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা ছোট নালা বেশ বড় গোছের একটা পাথুরে ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। নীল আলখাল্লা পরা দুজন আরবকে সেইখানেই দেখতে পেলাম। তাদের নেহাৎ নিরীহ মনে হল। যেন মনে কোনো হিংসাই নেই। আমাদের আসতে দেখে দুজনের কাউকেই নড়তে চড়তে দেখা গেল না।

রেমণ্ডের ওপর যে ছুরি চালিয়েছিল সে লোকটা কোনো কথা না বলে রেমণ্ডের দিকে শুধু এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। অন্য লোকটা আমাদের ওপর নজর রেখে একটা সরু শরের নলে ফুঁ দিয়ে ফিরে ফিরে তিনটে সুর বাজাতে লাগল।

খানিকক্ষণ সবাই আমরা নিস্পন্দ। শুধু সেই খাঁ খাঁ রোদ আর নিস্তব্ধতার মাঝখানে জলের মৃদু কুলুকুলুর সঙ্গে শরের বাঁশির তিনটি একঘেয়ে সুরের শব্দ।

রেমণ্ড তারপর তার রিভলভারের পকেটে হাত দিলে। আরব দুজন তখনো চুপচাপ। যে লোকটা বাঁশি বাজাচ্ছিল তার পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো যে অদ্ভুত রকম বাঁকানো তাও আমার নজরে পড়ল।

তার দুশমনের দিকে চোখ রেখে রেমণ্ড জিজ্ঞাসা করলে, "দেব নাকি একটা গুলি চালিয়ে?"

তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ভেবে নিলাম। রেমণ্ডের এখন যা মেজাজ তাতে বারণ করলে হয়তো আরো রেগে গিয়ে গুলি ছুড়েই বসবে। তাই প্রথম যা মাথায় এল সেই কথাই তাকে বললাম।

বললাম—"এখনো লোকটা তোমায় কিছু বলে নি। এ অবস্থায় বিনা উত্তেজনায় গুলি মারাটা ছোটলোকের মত কাজ হবে।"

"বেশ" একটু চুপ করে থেকে রেমণ্ড বললে, "তাই যদি তোমার মনে হয় তাহলে বেটাকে একটু গালাগাল করে দেখি। জবাব কিছু দিলেই গুলি করব।"

বললাম, "ঠিক আছে। তবে ও ছুরি না বার করলে তোমার গুলি করা সাজে না।"

রেমণ্ড উসখুস করতে লাগল। শরের বাঁশি যার হাতে সে সমানে তখনও সেটা বাজিয়ে চলেছে। দুজনেরই নজর কিন্তু আমাদের দিকে।

রেমণ্ডকে বললাম, "শোনো, ডাইনের লোকটার তুমি মওড়া নাও আর রিভলভারটা আমায় দাও। অন্য লোকটা যদি গোলমাল কিছু করে বা ছুরি খোলে তাহলে আমি গুলি করব।"

রেমণ্ড রিভলভারটা আমার হাতে দেবার সময় রোদে সেটা ঝিকমিক করে উঠল।

কারুর এখনও কোনো নড়বার চড়বার লক্ষণ নেই। যেন চারিদিক থেকে সব কিছু আমাদের চেপে ধরে নিস্পন্দ করে দিয়েছে। আমরা শুধু নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি। রোদের আলো আর সমুদ্র, জলের কুলুকুলু আর বাঁশির আওয়াজের দুই নিস্তব্ধতার মাঝখানে এই বালির চড়াটুকুর ওপর সমস্ত সৃষ্টি যেন স্থির হয়ে গেছে।

ঠিক তখনই আমার মনে হল যে ইচ্ছে হলে গুলি করাও যায় আবার নাও করা যায়, আর করা বা না করা দুই একেবারে সমান।

তারপর হঠাৎ এক মিনিটে আরব দুজন একেবারে উধাও। গিরগিটির মত তারা কখন চক্ষের নিমেষে পাথরগুলোর আড়ালে সরে পড়েছে।

রেমণ্ড আর আমি এবার ফিরে চললাম। রেমণ্ডকে আগের চেয়ে অনেক খুশি মনে হল। সে তখন ফেরবার বাস ধরবার কথা বলছে।

বাংলোতে পৌঁছে রেমণ্ড তৎক্ষণাৎ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভেতরে চলে গেল। আমি কিন্তু নিচের ধাপেই থেমে দাঁড়ালাম। রোদের কড়া আলো যেন মাথার ভেতর মুগুর পিটছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে মেয়েদের আপ্যায়িত করবার মত আলাপ জমাবার তখন আমার উৎসাহ নেই। কিন্তু রোদের তাত এতো বেশী যে ওখানে ওই চোখ-ধাঁধানো আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাও কষ্টকর। দাঁড়ান কিম্বা চলে যাওয়া, দুই-ই প্রায় সমান। খানিকক্ষণ বাদে বালির চড়াতেই ফিরে গিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম।

যতদূর চোখ যায় সেই এক গনগনে রোদের ঝঁঝি। ছোট ছোট ঢেউগুলো যেন ছটফটিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে তপ্ত বালিতে জিভ বুলোচ্ছে। বালির চড়ার প্রান্তে পাথুরে ঢিবিটার দিকে আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম। মনে হচ্ছিল রোদে আমার রগ দুটো যেন ফুলে উঠছে। দুদিক থেকে চাপ দিয়ে আমায় যেন আর এগুতে দেবে না। এক একবার রোদের হলকা আমার মুখে লাগে আর দাঁতে দাঁত চেপে প্যান্টের পকেটে হাত দুটো মুঠো করে আমি প্রাণপণে রোদে ঝিমঝিম করা মাথাটা ঠিক রাখবার চেষ্টা করি। বালির ওপর কোথাও কোনো ঝিনুকের কুচি কি কাঁচের টুকরো থেকে রোদের তীক্ষ্ণ ঝিলিক চোখে লাগলে জেদ আমার আরো যেন বেড়ে যায়। হার আমি কিছুতেই মানব না। সমানে আমি হেঁটে চলি।

খানিক বাদে বালির চড়ার প্রান্তে কালো পাথুরে ঢিবিটা দেখা গেল। ঢেউয়ের ছিটে আর ঝকঝকে আলোর পাত দিয়ে যেন সেটা ঘেরা। আমি কিন্তু তার পেছনের সেই ঠাণ্ডা স্বচ্ছ জলের ধারার কথাই ভাবছিলাম, চাইছিলাম তার স্রোতের কুলুকুলু আওয়াজটুকু আবার শুনতে। এই রোদের ঝঁঝি আর মেয়েদের পানসে চোখ, সব কিছু থেকে রেহাই চাই সেই পাথুরে ঢিবিটুকুর ছায়ায়, সেখানকার শীতল স্তব্ধতায়।

কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম রেমণ্ডের দুশমন সেই আরব আবার ফিরে এসেছে। এবার সে একাই মাথার পিছনে হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে আছে। মাথাটা তার ঢিবির ছায়ায় বাকি শরীরটা রোদে। গরমে তার আলখাল্লা থেকে ভাপ উঠছে দেখলাম।

তাকে দেখে একটু চমকেই গেলাম। আমার কেমন ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা চুকে গেছে। আসবার পথে তাই এ বিষয়ে কিছুই ভাবি নি।

আমায় দেখে লোকটা একটু মাথা তুলে তাকিয়ে পকেটে হাত দিলে। আমিও অবশ্য কোটের পকেটে রেমণ্ডের রিভলভারটা চেপে ধরলাম। লোকটা তারপর আবার শুয়ে পড়ল। হাতটা কিন্তু তখনও তার পকেটে।

আমি অন্তত দশ গজ দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। ঝাঁ ঝাঁ রোদের হলকায় লোকটা আমার চোখে যেন ঝাপসা একটা কালো ছায়ার মত কাঁপছিল। আধ-বোজা চোখের পাতার ভেতর থেকে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি কিন্তু মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিলাম। ঢেউয়ের শব্দ তখন দুপুরের চেয়ে আরো অলস ও মৃদু হয়ে এসেছে। কিন্তু রোদের ঝাঁজ কমেনি। পাথুরে ঢিবি পর্যন্ত বিছানো লম্বা বালির চড়ার ওপর সে রোদ যেন হিংস্রভাবে ঘা দিচ্ছে। দু ঘণ্টার ভেতর সূর্য একটু নড়েছে বলে মনে হয় না। গলানো লোহার সমুদ্রে তা যেন স্থির হয়ে আছে। অনেক দূরে সাগর দিগন্তে একটা জাহাজ যাচ্ছে। লোকটার দিকে কড়া নজর রেখেও চোখের কোন দিয়ে চলন্ত জাহাজের সেই ছোট্ট কালো রেখাটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

মনে হল ফিরে দাঁড়িয়ে এখান থেকে চলে গিয়ে ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গেলেই

তো হয়।

কিন্তু রোদের উত্তাপে স্পন্দমান সমস্ত বালির চড়াটা যেন পেছন থেকে আমায় ঠেলছে।

জলের ধারাটার দিকে আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম, আরবটা নড়ল না। আমাদের দুজনের মধ্যে এখনো বেশ খানিকটা তফাৎ। মুখের ওপর ছায়া পড়ার জন্যেই বোধ হয় মনে হল সে যেন আমার দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসছে।

আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। রোদের তাতে আমার মুখ ঝলসে যাচ্ছে। চোখের ভুরুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মার শেষ কাজের সময় যে রকম গরম পেয়েছিলাম, এও ঠিক সেই রকম। সেই রকম বিশ্রীই আমার লাগছিল—বিশেষ করে মনে হচ্ছিল কপালের শিরাগুলো চামড়ার ভেতর থেকে কেটে বেরিয়ে আসবে।

আর সহ্য করতে না পেরে এক পা এগিয়ে দাঁড়ালাম। এক পা এগিয়ে দাঁড়াবার অবশ্য কোনো মানেই হয় না। দু এক গজ গিয়ে তো আর রোদ এড়ানো যাবে না তবু সেই এক পা সেই একটি মাত্র পা এগিয়ে গেলাম, আর আরবটা তার ছোরা বার করে রোদের আলোয় আমার দিকে তুলে ধরলে।

ইস্পাতের ছোরা থেকে আলোর একটা ঝিলিক উঠে মনে হল আমার কপালে একটা লম্বা সরু ফলা বিঁধে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ভুরুর ওপর ঘাম যা বসেছিল সব দু চোখের পাতার ওপর ঝরে পড়ে একটা তপ্ত পাতলা পর্দায় তাদের ঢেকে দিলে। সেই নোনা ঘাম আর চোখের জলের আবরণে দৃষ্টি তখন আমার অন্ধ। শুধু মাথার মধ্যে সূর্যের প্রচণ্ড করতাল বাজছে টের পাচ্ছি, আর তার চেয়ে অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে যেন ছোরা থেকে ঝলকে-ওঠা আলোর তীক্ষ্ণ ফলা আমার চোখের পাতাগুলো চিরে চোখের তারার মধ্যে বিঁধে যাচ্ছে।

তারপর আমার চোখের ওপর সব কিছু দুলতে লাগল। সমুদ্র থেকে একটা জ্বলন্ত দমকা হাওয়া ছুটে এল আর আকাশটা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত চিড় খেয়ে দু ফাঁক হয়ে সেই ফাটলের ভেতর দিয়ে বিরাট একটা আগুনের স্রোত নেমে এল। আমার শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন ইস্পাতের স্প্রিং হয়ে গেছে। পিস্তলটা তখন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছি। পিস্তলের ঘোড়াটা ছুটে গেল। হাতের তেলোতে বাঁটের মসৃণ তলার দিকটার ধাক্কা টের পেলাম। আর সেই চাবুকের মত ক্ষিপ্র আওয়াজের সঙ্গে সব কিছু শুরু হয়ে গেল। ঘাস আর আলোর জড়ানো আবরণ আমি নাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেললাম। এই দিনটিতে এই বালির চড়ার যে বিশাল শান্তি আমায় অমন তৃষ্ণি দিয়েছে তা যে ভেঙে আমি চুরমার করে দিয়েছি আমি জানি। কিন্তু তবু আরো চারবার সেই অনড় দেহটায় আমি গুলি করলাম। গুলিগুলো চোখে দেখার মত কোনো চিহ্ন যেন রেখে গেল না।

পরপর প্রত্যেকটি গুলি বুঝি আমার সর্বনাশা নিয়তির দরজায় করাঘাত।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র [ক্রমশঃ]

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বজাতি-প্রীতি ব্যবসায়ীদের নীতি নয়। হওয়াও সম্ভব নয়। আত্মকেন্দ্রিক মনের মধ্যে যেখানে আল-ভেগে অন্য মানুষ এসে ঢুকেছে, অন্যের জায়গা হয়েছে মনের মধ্যে, সেখানে আপনার স্বার্থ না ছেড়ে ব্যক্তির উপায় নেই। ব্যবসায়ী সেই জাতের মানুষ যে লাভের কাণা-কড়িও ছাড়তে রাজি নয়। এই জাতের মানুষের শ্লোগান—আপনি বাঁচলে বাপের নাম—নয়, এদের শ্লোগান হচ্ছে—আপনি লোটাই সেরা কাম আর তাতেই বাপের নাম। সব পিপাসার মধ্যেই একটা আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মাভিমুখিনতা আছে, তাই মুনাফা লোটার পিপাসার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে অন্য পিপাসাগুলির চরম নিবৃত্তি না থাকলেও একটা সাময়িক পরিতৃপ্তি আছে। মুনাফাখর্মী মানুষদের এই সাময়িক নিবৃত্তি, সাময়িক পরিতৃপ্তি বলে কোনো কিছুর সঙ্গে পরিচিতি নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লোহার সিন্দুকে বন্দী করবার জন্যে ব্যবসায়ীরা মরিয়া। লুটের বখ্‌রা এরা কারো সঙ্গে করতে রাজী নয়। একদেশের লোক তাদেরও সুযোগ দাও দুপয়সা করতে—এ ধর্ম-বুলিতে এদের হৃদয়ের চিড়ে আদবেই ভেজে না। ব্যবসা করতে নেমেছি, ব্যবসা করবো, অর্থাৎ যেখানে যা পাবো নিজের লোহার সিন্দুকের উদরস্থ করবো। সেখানে জাতের বেরাদারি নেই, এক ছাপ-মারা ধর্মের নামাবলী গায়ে দিই আমরা, সেই দোহাইয়ের বালাই নেই, এক ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আমাদের বাস অর্থাৎ আমরা এক দেশের লোক, এই গদগদ মিঠে বুলিরও কদর নেই। জঙ্গলের পশুদের পশুস্বতন্ত্রতা মানুষের সমাজে ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা নাম নিয়ে রাজ-সিংহাসন দখল করে বসেছে। ব্যবসায়ী মানুষ তাই দেশ মানে না, জাতি মানে না। বিশ্বত্যাগবাদী মানুষও দেশকে ও জাতিকে চরম বলে মানে না কিন্তু সে না-মানার মধ্যে রয়েছে বিশ্বমানবকে মানা। ব্যবসায়ীর দেশ ও জাতি না-মানার মধ্যে আছে বিশ্বমানবকে অস্বীকার করা, শুধু নিজের লোভ ও ভোগকে মানা। তাই শত্রুর কাছে যুদ্ধের সময়ে গোলাবারুদ বেচে মুনাফা লুটতেও ব্যবসায়ীদের বাধে না। দুনিয়ার সঙ্গে নাড়ির যোগ-হারা মানুষের দল হচ্ছে ব্যবসায়ীরা।

যে চার্টার-এ্যাক্‌ট্ অনুযায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর পত্তন হয় সেই এ্যাক্‌ট্ অনুযায়ী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার ছিলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর। তা ছাড়া বাণিজ্য কিম্বা কৃষি-কার্য করবার উদ্দেশ্যে যদি কোনো ইয়োরোপীয় এদেশে এসে বাস করতে চাইতো তা হোলে তাকে ভারতবর্ষে না আসতে দেবারও পূর্ণ ক্ষমতা ছিলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর। এই অপ্রতিহত একচেটিয়া অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, কেউ যেন ঘা দিতে না পারে এই অধিকারে সেই দিকে কম্পানীর খুব তীক্ষ্ণ নজর ছিলো। বাণিজ্যের অবাধ অধিকার (Free trade) কম্পানীর দৃষ্টিতে ছিলো নরহত্যার সমান পাপ। সেই সময়কার কম্পানীর কর্তাদের বাণিজ্যের অবাধ অধিকার সম্বন্ধে কি মনোভাব ছিলো তার দুটি তিনটি নমুনা দিই।

অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free trade) গ্রহণ করলে কম্পানীর কি ক্ষতি হবে সেটা বর্ণনা করে মিঃ ফ্রান্‌সিস্ ১৭৭৫ খৃস্টাব্দের ১২ই মে তারিখে এক রিপোর্ট পাঠান বিলেতে ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্‌টরদের কাছে। সেই রিপোর্টে ফ্রান্‌সিস্ বলেন—

"A measure which tends to throw the farming of lands into the hands of European must independently of every other consideration, be attended with difficulties *prejudicial to the Company's revenues* (Italics mine—S.T.). The mode of collection in this country must at once be rigid, regular and summary. *The natives have at all times been subject to decisions of the Dewan, or of the courts instituted by his authority. If British subjects, or their servants are permitted to rent farms, there will be no way of recovering any arrears or balances due from them to the Company, but by instituting suits against the parties in the Supreme Court of Judicature* (Italics mine—S.T.). . . . . It appears to me that, under such a system, the revenues could not be realised, the collections would universally fail, and in the end our possession of the country would be very precarious."

মিঃ ফ্রান্‌সিস-এর রিপোর্ট থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রদ করে যদি ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে অবাধ বাণিজ্য করবার সুযোগ দেওয়া যায় তাহোলে কম্পানীর আয় কম হয়ে যাবে, এই তাঁর ভয়। ভারতবাসীরা দেওয়ানের বিচার অর্থাৎ অত্যাচার, জুলুমবাজি ও জোর করে আদায়, মাথা পেতে মেনে নিতো, ইয়োরোপীয়েরা তো তা মানবে না। তারা যদি কৃষি-ফার্মের মালিকানা পায় তাহোলে তারা খাজনা না দিলে সে খাজনা আদায় করবার জন্যে সুপ্রীমকোর্টের শরণাপন্ন হতে হবে, আর তার ফলে আদায় কমে যাবে আর শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের উপর কম্পানীর দখলও টেকানো শক্ত হবে। ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্য করবার সুযোগ দিলে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে বেপরোয়া লুঠ করছিলো, বে-আইনী আদায় করছিলো, সে সব বন্ধ হয়ে যাবে। জিনিসের দাম কমে যাবে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার ফলে, চাষীদের উপর যে জুলুম চলছিলো তা বন্ধ হয়ে যাবে ইয়োরোপীয়েরা যদি কৃষি-ফার্মের মালিক হয়ে বসে, আইন-সম্মত উপায়ে খাজনা নিতে হবে তখন—এসব কি কখনো বরদাস্ত করতে পারে লুঠেতরাজে সিদ্ধহস্ত যথেচ্ছাচারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মালিকেরা কিম্বা তাদের কর্মচারীরা?

ইয়োরোপীয়েরা বেশী সংখ্যায় ভারতবর্ষে এসে বাণিজ্য করলে কিম্বা কৃষি-ফার্ম পত্তন করে বসলে যে কি ভয়ানক ক্ষতি হবে তা চিন্তা করে মিঃ শোর নামক কম্পানীর একজন হোমড়াচোমড়া কর্মচারী যে কি পরিমাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তা বলা যায় না। তাঁর যুক্তি কিন্তু অন্য, আর সে যুক্তি খুবই উপভোগ্য। মিঃ শোর বলছেন—

"It is very obvious, that within the last ten or twelve years, a considerable alteration has taken place in the manners of the people. This alteration is the natural consequence of a greater degree of intimacy with Europeans than they were formerly admitted to. *They have since found out that we are not wholly destitute*

of weaknesses and vices, and that Europeans like all others, are open to temptation. The respect they entertained for us as individuals, or as a nation is diminished, and they now consider themselves upon a more equal footing." (Italics mine—S. T.).

মিঃ শোর-এর ভারী ভয় পাছে এ দেশের লোক ইংরেজ বণিকদের আসল চেহারাটা কাছ থেকে দেখে ফেলে বণিক-দেবতাগুলির সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। শোর সাহেবের আপ্‌শোষের শেষ নেই যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বণিকদের আসল রূপ ধরে ফেলেছে এদেশের লোক। ইংরেজদেরও যে অনেক দোষ থাক্‌তে পারে ও আছে, তারাও যে নানা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এটা ভারতবাসীরা বুঝে নিয়েছে, এটা কি কম দুঃখের কথা! শোর সাহেবের মতে এই জন্যেই ভারতীয়দের ভক্তি কমে গেছে ইংরেজের উপর আর তার ফলে ভারতীয়েরা নিজেদের ইংরেজদের সমান সমান বলে ভাবতে সুরু করেছে। ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের বেশী মেশামেশি হলেই চটক ভেঙ্গে যাবে, অল্প মেশামেশির ফলেই এটা ঘটেছে আর বেশী মাখামাখি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে শোরের ভয় ও ভাবনা। তাই তাঁর মতে ইংরেজদের বেশী সংখ্যায় এদেশে আসতে দিলে মারাত্মক ভুল করা হবে।

এখানেও মতলবটি সুস্পষ্ট। ইংরেজদের যাতে এদেশের লোক ভয় করে, সম্ভ্রম করে, দেবতা গোছের কিছু একটা ভাবে সেটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। এটা একটা চতুর ও খুব প্রয়োজনীয় কৌশল্ অন্য দেশকে দখল করে সে দেশের লোকদের গোলাম বানাবার ও লোটবার।

এবারে ইয়োরোপীয়দের এদেশে এসে বাণিজ্য করতে দেওয়া ও চাষবাস করতে দেওয়া সম্বন্ধে তখনকার গভর্নর-জেনারল্-এর মতটা একবার দেখা যাক। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর গভর্নর-জেনারল্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্‌টরদের লিখছেন—

"If the proposed (Free trade) scheme were adopted, multitude of Europeans would flock into the interior parts of the country ; *they would naturally possess themselves of the seats of manufactures abandoned by the Company* (Italics mine—S.T.), eager competition must immediately arise, enhanced prices and debased fabrics follow. *The weavers would receive advances from all* (Italics mine—S.T.), each would be ready to take redress into his own hands ; dispute between merchants, as well as between them and the manufacturers would be inevitable ; and the country then in all probability, become a scene of confusion and disorder . . . . . How far a salutary freedom and extension of commerce would be promoted by such means, it cannot be hard to determine."

ইয়োরোপীয়েরা বেশি সংখ্যায় এদেশে এলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি ছেড়ে দিয়েছে সেগুলি এরা দখল করবে, ব্যবসায়ে তীব্র প্রতিযোগিতা সুরু হবে, একচেটিয়া বাণিজ্যের মজা লোটবার আর সুযোগ থাকবে না কম্পানীর, এ মর্মান্তিক অবস্থা কম্পানীর নায়েব গভর্নর-জেনারল্ সাহেব কি করে ঘটতে দিতে পারেন! তাছাড়া তাঁতীরা নানা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দাদন পাবে, তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে, এটাই বা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কর্তারা কি করে সহ্য করেন? কম্পানীর হাতে তাঁতীদের দুর্দশার তো সীমা ছিলো না। যতো অল্প দাম দিয়ে তাদের কাছ থেকে কাপড় কেনা যায় তার ব্যবস্থা কম্পানীর লোকেরা করেছিলো। ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার কম্পানীর হাতে থাকায় অল্প দামে কিনে চড়া দামে বেচবার সব সুযোগ কম্পানী ভোগ করছিলো। এখন অন্য লোকদের ব্যবসার সুযোগ দিলে দু হাতে লোটবার যে বিমল আনন্দ কম্পানীর আমলারা এতোদিন ভোগ করে আসছিলো তাতে বাদ সাধতে হয়। কম্পানীর নায়েব গভর্নর-জেনারল সেটা কি করে বরদাস্ত করে? তাছাড়া জালিয়াতী যুক্তি দিয়ে লোক ঠকানো যে শুধু এ কালেই চলে তা নয়, সে কালেও দিব্যি চল্‌তো। গভর্নর-জেনারল্ সাহেবের চিঠি তার প্রমাণ দিচ্ছে। গভর্নর-জেনারল্ লিখছেন যে অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু করলে আর ইয়োরোপীয় এদেশে এসে বাণিজ্য করা সুরু করলে বাজারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হবে আর তার ফলে জিনিসের দাম বাড়বে আর কাপড়ও আগের চেয়ে খারাপ তৈরী হবে। (Enhanced prices and debased fabrics follow) কম্পানীর ডিরেক্‌টরদের বুদ্ধির বহর কি ছিলো তা জানবার উপায় আজ নেই, তবু জেনে শুনে ঠক্‌তে চায় এমন লোক আর নেহাৎ নির্বুদ্ধি লোক ছাড়া গভর্নর-জেনারলের এই যুক্তি কেউ মানতে পারে বলে তো মনে হয় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জিনিসের দাম বাড়ে না, কমে, আর জিনিস নীরেস হয়ে যায় না বরঞ্চ আরো সরেস হয় রেষারেষির ফলে, কেননা যার জিনিস অন্যের চেয়ে ভালো সে-ই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতে। কম্পানীর ডিরেক্‌টরেরা গভর্নর-জেনারলের এই অসম্ভব যুক্তি গোগ্রাসে গিলেছিলেন কি না তা জানতে কৌতূহল হয়।

আসল কথাটা হচ্ছে যে ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে বাণিজ্য করবার ও চাষবাস করবার অধিকার দেওয়া উচিত, না উচিত নয়, এই নিয়ে অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যে লড়াইটা চলছিলো সেই লড়াইটা আসলে ছিলো—বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার-এর (Monopoly) নীতির সঙ্গে বাণিজ্যের অবাধ অধিকারনীতি-র (Free trade) লড়াই।

যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর যখন সূত্রপাত হোলো, ক্যাপিটালিজমের সেই প্রারম্ভকালে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার যাদের হাতে ছিলো তারা যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর সম্প্রসারণে বাধা দিয়েছে। সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার যুগে জমিদারী প্রথার সঙ্গে কুটীর-শিল্প-প্রণালী যুক্ত ছিলো এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাঁধনে। যান্ত্রিক-উৎপাদন প্রণালী চালু হলে চারিদিকে কলকারখানা গজিয়ে উঠ্‌বে, তার ফলে গ্রামের কুটীর-শিল্প থেকে জমিদারেরা জবরদস্তি যে আদায়টা করতো সেটা আর সম্ভব হবে না। এই জন্যেই যন্ত্র-শিল্পের প্রবর্তনে জমিদারেরা এতো বাধা দিয়েছে। ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ছলে বলে কৌশলে রাজস্ব কায়েম করে নিলো। এই রাজস্ব কায়েম করা তো পরমার্থ সাধনের জন্যে নয়, অসভ্যদের সভ্য করার (Hellenic mission) জন্যেও নয়। পরমার্থকে সিকেতে তুলে রেখে অর্থ কি করে লোটা যায়, অসভ্যদের দেশে যা কিছু লভ্য আছে তা কি করে ঝুলি ভরে সাগরপারে পাঠানো যায় তারই ভাবনায় বিভোর ছিলো এই বিদেশী বণিকের দল। যে অর্থনৈতিক নীতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী অনুসরণ করলো ভারতে, যে নীতি কার্যকরী করবার জন্যে তাদের বাদশাহী পত্তন করা ভারতবর্ষে, সেই নীতির মূল সূত্র ছিলো ভারতবর্ষ থেকে যতদূর সম্ভব কাঁচা মাল আর কুটীরশিল্পজাত জিনিসগুলি লোটা, বিশেষ করে কাপড়, আর সেগুলি ইংলণ্ডে পাঠানো, আর ইংলণ্ডের কলকারখানায় তৈরী জিনিসগুলি ভারতবর্ষে এনে ভারতের বাজারে বিক্রী করা। ভারতবর্ষে যাতে কল-

কারখানা গজিয়ে না ওঠে, ভারতের কুটীর-শিল্পগুলিও যাতে ধ্বংস হয়ে যায়, ভারতবর্ষ যাতে ইংলণ্ডের কলকারখানাগুলোর কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে বেঁচে থাকে—এই ছিলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর অর্থনৈতিক নীতি। বাংলার তাঁতীদের মেরে ইংলণ্ডের কলের তৈরী কাপড়ে যাতে আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলা যায় তার জন্যে কম্পানীর আমলাদের বর্বর চেষ্টার কথা সর্বজনবিদিত। বিলেত থেকে যে সব জিনিস আমদানী করা হোতো সেগুলো খুসিমত চড়া দামে বেচতো কম্পানী, কেননা কম্পানীর ছিলো একচেটিয়া অধিকার তার দখল-করা এলাকার বাজারে। ইয়োরোপের কারখানার তৈরী জিনিস এনে অন্য কেউ ইয়োরোপীয়, কম্পানী, অধিকৃত এলাকার বাজারে বিক্রী করতে পারতো না। কৃষির উন্নতির দিকেও কম্পানীর নজর ছিলো না। যে কাঁচামালগুলি ইংলণ্ডের তদানীন্তন শিল্পগুলির জন্যে প্রয়োজন ছিলো শুধু সেই কাঁচামালগুলির উৎপাদনের দিকে তাদের নজর ছিলো। এই ছিলো কম্পানীর অর্থনৈতিক নীতি আর এই অর্থনৈতিক নীতির ফাঁস গলায় পরিয়ে কম্পানী-শাসিত এলাকার লোকদের আধমরা করে রেখেছিলো কম্পানী। কম্পানীর একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকারের আওতায় ভারতীয়দের অর্থনৈতিক উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের সেই স্রোতহীন মরা জলে অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের ঢেউ এসে পৌঁছলে একটা স্রোত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা জাগে বৈকি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাইরে থেকে দলে দলে ব্যবসায়ীরা যারা অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের নীতি (Free trade) গৃহীত হলে আসবে তারা কি মুনাফা লোটার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে? একচেটিয়া ব্যবসা অধিকারের মজা-লুটনেওয়ালা ব্যবসায়ীরা হোক কিম্বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবাধ বাণিজ্য-অধিকারের সুযোগ-লুটনেওয়ালা ব্যবসায়ীরা হোক, দুদলেরই উদ্দেশ্য এক—পকেট-থলে-সিন্দুক ভরে মুনাফা লোটা। তফাৎ হয় শুধু ব্যবসার ধরণটা, ব্যবসার উদ্দেশ্য একই থেকে যায়। কিন্তু এটাও জানা দরকার যে ধরণটার তফাৎ অর্থাৎ রীতির তফাৎ থেকেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। সব সময়ে নীতির তফাৎ থেকে পরিবর্তনের সূত্রপাত নয়। কিছু লোক যেখানে একচেটিয়া ভাবে ব্যবসা করে মুনাফা লুটছে সেখানে যখন হুড়মুড় করে অগুনতি ব্যবসায়ীরা এসে ঢুকে পড়ে, তখন জোয়ার আসে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বন্ধ জলে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন মুনাফা লোটবার জন্যে নতুন নতুন ধান্দা জাগে ব্যবসায়ীদের মনে। তার ফলে নতুন নতুন জিনিস তৈরী হয় আর নতুন নতুন কাঁচা মাল উৎপন্ন করবার দিকে দৃষ্টি পড়ে ব্যবসায়ীদের। ইতিহাসের ধারা তলিয়ে দেখলে আমরা এইটেই দেখি যে লোভী মানুষ ব্যক্তিগত লোভের উস্কানিতে কাজ করে চলে কিন্তু তার ব্যক্তিগত স্বার্থের ফাটলের ভিতর দিয়ে সমাজের কল্যাণের তরু মঞ্জরিত হয়। এই মুনাফাধর্মী সমাজে মানবসমষ্টির কল্যাণ হচ্ছে লোভী মানুষের স্বার্থ-ধর্মী কাজের বাই-প্রডাক্ট্ অর্থাৎ পড়ে-পাওয়া অযাচিত ফল। তাই ধর্মনীতিরও দিক থেকে বিচার করলে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারীদের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার-ভোগীদের কোনো পার্থক্য না থাকলেও, ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকে বিচার করলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে ক্যাপিটালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায় একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের জায়গায় অবাধ-বাণিজ্যের অধিকারের প্রবর্তন অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচনা করে।

শুধু যে ভারতবর্ষেই ইতিহাস এই পথ ধরে চলেছিলো তা নয় সিংহলেও এই এক-চেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে লড়াই চলছিলো অবাধ-বাণিজ্যনীতির। দিনেমারদের হাত

থেকে সিংহল যখন ইংরেজদের হাতে গেলো তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতেই সিংহলের শাসনভার ন্যস্ত হোলো। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এই ব্যবস্থা করে নিলো যাতে এই কম্পানীর সাহেবরা ছাড়া আর কোনো ইয়োরোপীয় এসে সিংহলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসবাস না করতে পারে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট সিংহলের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে নিলো। সিংহলের ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষির কি উপায়ে উন্নতিসাধন করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দাখিল করবার ভার দেওয়া হোলো সার্ অ্যালেক্জান্দার জন্স্টনের উপর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে।

সার্ অ্যালেক্জান্দার যে রিপোর্ট দাখিল করলেন তাতে বললেন যে যদি সিংহলের ব্যবসা বাণিজ্যের ও কৃষির উন্নতি সাধন করতে হয় তাহোলো বিজ্ঞান, যান্ত্রিক-উৎপাদন-প্রণালী ও ইয়োরোপীয় মূলধন—এই তিনটি জিনিসের প্রয়োজন সিংহলে; আর তার জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রদ করে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তন করতে হবে ও ইয়োরোপীয়দের সিংহলে এসে বাণিজ্য ও কৃষির জন্যে বসবাসের অধিকার দিতে হবে। সার্ অ্যালেকজান্দারের এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে অবাধ-বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তিত হোলো আর ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষির জন্যে ইয়োরোপীয়দের সিংহলে এসে বাস করার বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে সব নিয়মকানুন তৈরী করেছিলো সেগুলো রদ করে দেওয়া হোলো।

সিংহলে যন্ত্র-বিপ্লব (Industrial revolution) সুরু হয়ে গেলো যার আর এক নাম ইতিহাসের পরিভাষায়—বুর্জোয়া বিপ্লব। বাংলার দিকে আবার ফিরে তাকানো যাক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর অর্থনৈতিক স্বার্থের শ্বাসরোধ-করা ফাঁস তখন বাংলার গলায় পরানো রয়েছে। একচেটিয়া বাণিজ্যের কারাগারে বাংলাকে বন্দী রেখে তাকে শুষে নিচ্ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী। যন্ত্র-শিল্প প্রবর্তনের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না সে অবস্থায়, নতুন কৃষি-জাত কাঁচা মালের ফসল ফলাবার সম্ভাবনাও না। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের সম্প্রসারণের সব পথ ঘাট বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছিলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী। তখন ব্যক্তিগত লাভের আশায় যারা সেই দুর্গের দেয়াল ভেঙ্গে ঢুকতে এলো তারা বান আনলো বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের মরা গাঙে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কড়াক্রান্তি চললো, বাঁধন একটুও আলগা হোলো না। নীলকর সাহেবেরা গ্রামাঞ্চলে জমির মালিকানা পাওয়ার জন্যে বার বার আর্জি করলো বাংলার গভর্মেণ্টের কাছে কিন্তু তাদের সব আবেদনই অ-মঞ্জুর থেকে গেলো। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার গভর্মেণ্টের ইচ্ছে হোলো বাংলা দেশে কফির চাষ সুরু করতে। কিন্তু ইয়োরোপীয়দের জমির মালিক হবার অধিকার না দিলে কফির চাষ সুরু করা সম্ভব ছিলো না। অগত্যা গভর্মেণ্ট বাধ্য হোলো ইয়োরোপীয়দের জমির মালিক হবার অধিকার দিতে—অবিশ্যি সেই অধিকার দেওয়া হোলো আটঘাট বেঁধে বিশেষ সর্তে। নিরুপায় হয়ে সেই সব সর্ত মেনে নিয়েই কফির চাষের জন্যে জমি কিনলো ইয়োরোপীয়রা। সুরু হোলো কফির চাষ বাংলা দেশে। ইয়োরোপীয়রা তাই বলে হাল ছেড়ে চুপ করে বসেছিলো মনে করলে ভুল করা হবে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা-বাসিন্দে ইয়োরোপীয়রা একটি সভা ডাকলো টাউন হলে। ইংরেজদের ভারতবর্ষে বাস-বিষয়ে যে সব আইনগত বাধা ছিলো সেই বাধাগুলিকে অপসারিত করবার জন্যেই এই সভা ডাকা হয়। বাংলা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি ও কৃষির উন্নতি সাধন করতে ইংরেজ বণিকেরা যে সাহায্য করেছে

তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা ইংরেজ বণিকদের মুখে থেকেই শোনা গেলো সে দিনের সভায়। সভা থেকে প্রস্তাব পাশ করে দরখাস্ত হিসেবে সেটা পাঠানো হোলো গভর্মেণ্টের কাছে—কিন্তু কোনই ফল ফল্‌লো না। গভর্মেণ্ট তখনো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ইসারাতেই ওঠে, বসে, চলে, তাই জয় হোলো কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার-নীতির।

এই মিটিংয়ের মাস তিনেক পরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'একজন জমিদার' এই স্বাক্ষরযুক্ত একটি বিবৃতি বের হোলো সংবাদ-কৌমুদী পত্রিকায়। এই 'একজন জমিদার' আর কেউ নয়, স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিবৃতিটি উদ্ধৃত করার যোগ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর লিখছেন—

"A few weeks ago there was a meeting held in the Town Hall, for the purpose of petitioning Parliament to equalize the rates of duty on the sugar exported from the West Indies and from this country, and to allow British-born subjects unrestricted residence in India. When after a free and lengthened discussion, several resolutions were proposed and passed, a clergyman, whose ruling passion is only contention and quarrelling, instead of opposing any of the objects of the meeting openly, expressed to a native acquaintance his entire disapprobation of the last mentioned object and has since, I understand, persuaded him and some others through him, to present a counter-petition, which is now under preparation by the Reverend Gentleman.

From what our native friends heard from that Minister of the gospel, they have formed the opinion, that the ultimate object of that prayer was to displace the native landholders from their respective estates by allowing Europeans to possess the landed property in the country, and to make a general effort, through the vast number of European residents, to convert the Hindoos to Christianity.

Under this impression, they have drawn up a sketch of their intended counter-petition, and given the same to the Revd. Gentleman to revise it, and to suggest any further agreements that might give weight to the counter-petition, but being advocates for a bad cause, they have not yet been able to come to a conclusion.

Both in their conversation and writings, they generally refer to the alleged disadvantages and injuries resulting from indigo plantations throughout the country by European gentlemen, and make attempts to give the public to understand, that Europeans having already occupied a great portion of land productive of paddy etc., for the plantation of indigo, the scarcity of rice, the principle food of the native population, is severely felt and consequently the lower classes have been involved in great distress and trouble from the want of the necessaries of life.

It is however wellknown to every one, who has an estate in the country, and personally conduct the affairs of his zamindary, *to what great degree waste lands have been cultivated in consequence of indigo plantation and how comfortably the lower classes are spending their days from the dispersion of money throughout the country by the indigo planters. Those peasants who were in former times forced by their Zemindars to labour for them without any remuneration or for the gift of a small quatnity of rice, are now enjoying some freedom and comfort under the protection of indigo planters, each receiving for his labour, a salary of about four rupees per month from these planters of indigo, and many persons of middle rank, who know not how to maintain themselves and their families, being employed as Sirkars etc., under these ingido planters at a higher salary, remain no longer victims to the whims of Zamindars and great banyahs* (Italics mine—S. T.).

From these circumstances, it can be justly inferred, that should the unrestricted residence of European gentlemen be permitted, and thereby a great number of Europeans become permanent settlers in different parts of the country to carry on plantation, commerce, etc., the condition of the lower and middle classes would certainly be more improved and the soils better laid out, *a circumstance the apprehension of which is mortifying to the self-interested landholders, who are eagerly desirous to trample down the lower and middle classes within their respective circles.* (Italics mine—S. T.).

From a reference to the reports made from time to time to Government by its inquisitive judges, *the cruel behaviour of the Zamindars towards their ryots, will be satisfactorily proved* (Italics mine—S. T.). Besides several landholders, who did not or very seldom visit their respective zamindaries, placing confidence in their managers and stewards, allow them entire power over the cultivation; but the managers generally abuse the trust placed in them, and grievously oppress the ryots for their own advantage. They ultimately compel many of the cultivators through extortion to fly to other villages, leaving their huts unoccupied and soils totally waste. The false excuse which they offer to their masters is that

owing to the tyranny exercised by indigo planters, the revenue is reduced and cultivation diminished, and thereby they keep their masters in darkness.

Under these circumstances, I hope I shall be justified when I say, that whosoever is inclined to oppose the diffusion of knowledge among the natives by the British Government of India, and by many private individuals, among Europeans, or whosoever is disposed to oppose the unrestricted residence of Europeans in this country, provided certain changes shall at the same time be introduced into the system of administering justice, is an enemy of the natives and to their rising and future generations.

A Landholder.

দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই বিবৃতিটি নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতা দেখবার জিনিস, বিশেষ করে এ কালে, যে কালে শঠতা সমকালীন সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পদে প্রতিষ্ঠিতা। দ্বারকানাথ নিজে একজন প্রভূত সম্পত্তিশালী জমিদার ছিলেন। কিন্তু নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে জমিদারের দুষ্কর্মের সাফাই গাইবার কোনো প্রয়াস করেন নি দ্বারকানাথ। অকপটভাবে তিনি প্রজাদের উপর জমিদারদের ও জমিদারদের কর্মচারীদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের বর্ণনা করেছেন। এই জমিদারেরাই যে চাষীদের উপর অত্যাচার ও তাদের বেপরোয়া লুট কায়েম রাখবার জন্যে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি কিনে কৃষিকার্য করতে বাধা দিচ্ছে সে কথা দ্বারকানাথ সোজাসুজি বলেছেন। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তখন বহু অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল চারদিকে। অত্যাচারও যে তারা করছিলো না তাও নয়। অত্যাচার না করে কে কবে মুনাফা লুটেছে, সিন্ধুকে ভরেছে, ধনী হয়েছে! জীবে-দয়া-নামে-রুচি-র পন্থা ধরে তো জেব-এর উপর দয়া করা যায় না, রজত-কুচিতেও রুচি তৈরী করা যায় না। অগত্যা নীলকরসাহেবেরা যে 'মহাজন যেন গত স হি পন্থা' এই মহামন্ত্র জপ্‌তে জপ্‌তে চাষীদের জিভ বার করে দেবে তাদের বুটজুতোর চাপে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? জমিদারদের নাগরা জুতোর জায়গায় নীলকর-সাহেবদের বুট জুতো চাষীর বুকে মুখে পিঠে লাঞ্ছনা-চিহ্ন আঁকছিলো এই যা তফাৎ। তাই তফাৎ ঘটলো শুধু উপাদানের, লীলার নয়! তবে এটাও জানা ভালো যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনীগুলোকে বাড়িয়ে ফেনিয়ে দেশের লোকদের কাছে ধরে দিয়ে চাষীদের উপর অত্যাচার করবার তাদের যে একচেটিয়া অধিকার তারা এতোদিন নির্বিবাদে ভোগ করে আসছিলো সেটি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে মরিয়া হয়ে লড়ছিলো জমিদারেরা। এর প্রমাণ আমরা যথাস্থানে দেখবো। তাছাড়া আর একটা জরুরী জিনিস, মূল্যবান তথ্য যেটা নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী দিয়ে ঢাকা দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা করা হয়েছে আর যেটা দ্বারকানাথের সত্যনিষ্ঠ মনের দৌলতে আমরা জানতে পারলুম সেটি হচ্ছে এই যে নীলচাষের ফলে গাঁয়ের চাষী আর মধ্যবিত্ত দুই-ই লাভবান হয়েছিলো। চাষীরা জমিদারদের কাজ করে একটি পয়সাও পেতো না, তাদের বেগার খাটিয়ে নিতো জমিদারেরা। নীলকর সাহেবদের নীলকুঠির ক্ষেতে কাজ করে সেই চাষীরাই মাসে প্রায় চার টাকা রোজগার করতো।

একশো ত্রিশ বৎসর আগে চার টাকার যে কি মূল্য ছিলো তা সেদিনের বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের তথ্য যাঁদের জানা নেই তাঁদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। এটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে চার টাকায় সেদিন একটি ছোট্ট পরিবারের ভাল ভাতটা চলে যেতো। এই তো গেলো চাষীদের কথা। গাঁয়ের মধ্যবিত্তদেরও কম উপকার হয়নি নীলকুঠির কৃপায়। কেরানীর কাজ, নায়েবের কাজ, সরকারের কাজ, কতো রকমের কাজ তারা পেতো নীলকুঠিতে। জমিদারদের শিকারগুলো এম্‌নি করে সেদিন হাত-ছাড়া হয়ে গেলো এটা কি কখনো সহ্য হয় জমিদারদের? তাই চাষীদের দুঃখে জমিদারদের প্রাণ এতো বিগলিত, নীলকর সাহেবদের হাত থেকে চাষীদের বাঁচাবার জন্যে জমিদারদের এতো আকুলতা! দ্বারকানাথ অপূর্ব সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে জমিদারদের এই চাষী-প্রীতির মর্ম আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত দ্বারকানাথের ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টিতার তারিফ না করে পারা যায় না। তাঁর বিবৃতি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বুঝেছিলেন যে যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকার রদ করে দিয়ে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বাণিজ্য করবার ও কৃষিকার্য করবার অধিকার দেওয়া যায় তাহোলে বহু নতুন বাণিজ্যের সূত্রপাত হবে, বাণিজ্যের জন্যে নতুন নতুন কৃষিজাত দ্রব্যের চাষ সুরু হবে, দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে যাত্রা সুরু করবে। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এই ছিলো একমাত্র পথ। নতুন নতুন ব্যবসা পত্তন করে ও নতুন নতুন কাঁচা মাল তৈরী উৎপন্ন করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মরা গাঙে বান আন্‌তে হোলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বাঁধ ভেঙ্গে ইয়োরোপীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের স্রোত বইয়ে দেওয়া ছাড়া সে দিনের বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় আর কোনো পথ ছিলো না। একদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী, অন্য দিকে দেশীয় জমিদারের দল, এই দুই বাঁধের দৌরাত্ম্যে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের স্রোত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মরে যাচ্ছিল। ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন দ্বারকানাথ সেটা বুঝেছিলেন, তাই তিনি বাণিজ্য ও কৃষির জন্যে ইয়োরোপীয়দের এদেশে এসে বসবাসের সমর্থক ছিলেন। তিনি জানতেন যে সেই নতুন সূত্রপাতের পথ আরামের পথ নয়। অনেক মানুষের সুখসুবিধেকে উপেক্ষা করে ইতিহাস তার চলার পথ রচনা করে। চাষীরা স্বভাবতই গতানুগতিক-পন্থী, মান্ধাতার আদরের সন্তান তারা। পুরোনো জানা পথ ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো পথ নেই। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সেদিন চাষীদের যে অভিযোগ তার অনেকখানিই ছিলো অনভ্যস্ত নীল-চাষ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সংস্কারবশ্য চাষীদের আপত্তি ও দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারার গতি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টির সৌভাগ্য-বঞ্চিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বুদ্ধিহীন হৈচৈ। গ্রামের সেই অ-নড় জীবনকে নাড়িয়ে দিতে গেলে জোর ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন। যেখানে ঝড়ের প্রয়োজন সেখানে দখিনে বাতাসকে বরাদ্দ দিলে চলে কি? দ্বারকানাথ সেটা বুঝতেন, তাই তিনি বলেছিলেন—"এ দেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে ভারতের ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট এবং ইয়োরোপীয়দের মধ্যে থেকে বহু ব্যক্তিরা যা করছেন সেই প্রচেষ্টার যারা বিরুদ্ধতা করতে চায় এবং এদেশে ইয়োরোপীয়দের অবাধ বসবাসে যারা বাধা দিতে চায়, অবিশ্যি সেই বসবাস দেশের বিচার-পদ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন সাপেক্ষ, তারা বর্তমান দেশবাসীদের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শত্রু।"

দ্বারকানাথের বিবৃতি থেকে এটাও স্পষ্ট যে তিনি এদেশে ইয়োরোপীয়দের বিনা সর্তে বসবাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে আরো সুনির্দিষ্ট মত পোষণ করতেন। যথাসময়ে তার আলোচনা করা যাবে।

ইয়োরোপীয়দের এদেশে বসবাস ব্যাপার নিয়ে তখন যে আলোচনা চলছিলো আর নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তখন যে আন্দোলন চলছিলো কলকাতার পত্রিকাগুলিতে তার হদিশ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় এই মন্তব্যটি থেকে পাই—"কস্যাশ্চিৎ প্রজায়া ইত্যঙ্কিত পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়া অদ্যকার দূতপত্রে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু পত্রপ্রেরক ক্লোনিজেসিয়ন বিষয়োপলক্ষ করিয়া বর্তমান নীলকর সাহেবেরদিগের প্রতি যে যে দোষোল্লেখ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিন্তব্যের আবশ্যক হইল কেন না এরূপ মিথ্যা দোষ তাবৎ নীলকর সাহেবেরদিগের প্রতি দেওয়া অনুচিত বরং এ স্থলে লেখকের অতি কর্তব্য ব্যক্তিপ্রভেদ করিয়া দোষগুণ লিখিতে হয় তাহা না করিয়া সাধারণের প্রতি একবাক্য দ্বারা অন্যায় করা যুক্তিবিরুদ্ধ কিন্তু মফস্বলে সাহেবলোকেরদিগের নীলের কুঠী হওনে বিস্তর উপকার হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল ভূমি কস্মিনকালে আবাদ হইত না এইক্ষণে সেই সকল ভূমির কর অনেক উৎপন্ন হইবায় তালুকদারদিগের পক্ষে কত ভাল হইয়াছে তাহা লিপিবাহুল্য এবং বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁহারা অন্যান্য বিষয় কর্ম করিতে অক্ষম তাঁহারা কুঠীতে চাকরী করিয়া প্রায় অনেকেই ভাগ্যবন্ত হইয়াছেন পরন্তু প্রজাগণের পক্ষেও মঙ্গল হইয়াছে যেহেতুক মুদ্রা উপার্জনে যাহারা অক্ষম ছিল তাহারা নীলোপলক্ষে বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছে এবং মজুরলোকদিগের এমত উপকার দর্শিয়াছে যে পূর্বে যাহারা সমস্ত দিবা শ্রম করিয়া তিন পণ কড়ি উপার্জন করিতে পারে নাই তাহারা এইক্ষণে আড়াই আনা তিন আনা পর্যন্ত আহরণ করিতেছে। অতএব কহি ইঙ্গরেজলোকে এ প্রদেশে বাহুল্যরূপে কৃষিকর্ম করিলে উত্তরোত্তর প্রজারদিগের আরো উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।"

বাদানুবাদের ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে খেতে বাংলাদেশের দিনগুলি এমনি-ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মুঠো তখনো শিথিল হয়নি। মুঠো ফুটো করবার জন্যে ইংলণ্ডে ও ভারতে নানা শক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেছিল কিন্তু তখনো সে প্রচেষ্টাগুলি চূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দুর্গপ্রাচীরে ধাক্কা মেরে। বাংলাদেশের জনসাধারণের সেদিন না ছিলো অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে কি প্রয়োজন তার জ্ঞান, না ছিলো কণামাত্র রাজনৈতিক চেতনা। রামমোহন, দ্বারকানাথ আর তাঁদের বন্ধু ও সহকর্মী আরো দু-একজন—এই ছিলো সারা বাংলাদেশের মধ্যে চেতনা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের হিসেব। তাই বাংলাদেশের জনসাধারণের ধাক্কায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর অর্থনৈতিক দুর্গের তোরণ ধূলিসাৎ করবার কোনো সম্ভাবনাই তখন ছিলো না। যাদের হাতে ক্ষমতা ছিলো বাংলার সেই জমিদারেরা তারা তো ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে বাংলাদেশকে তাদের একচেটিয়া দখলে রেখেছিল—বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া অধিকার আর কৃষির ক্ষেত্রে জমিদারদের একচেটিয়া অধিকার। তাই জমিদারদের তরফ থেকে কোনো আন্দোলন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর বিরুদ্ধে, আশা করবার কোনই ঐতিহাসিক হেতু আমাদের নেই। সেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে আঘাত হানবার, তার একচেটিয়া অধিকারের তলা ফুটো করে দেবার একমাত্র শক্তি ছিলো—ইংরেজ বণিকরা। তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর অধিকারের উপর

আঘাত হানবে, এই ছিলো ইতিহাসের নির্দেশ সেই যুগে। তাই বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো ভেঙে সেখানে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সম্ভাবনা ঘটবে ইংলণ্ড—এই ছিলো সে যুগের ইতিহাসের নির্দেশ। ইতিহাসের সেই নির্দেশ বুঝেছিলেন রামমোহন আর দ্বারকানাথ। তাই তাঁরা নির্দিষ্ট সর্তানুসারে ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন। তবে সবাই রামমোহনের ও দ্বারকানাথের উদ্দেশ্য ধরতে পারবে ও বুঝতে পারবে এটা আশা করা অন্যায়। বেশীর ভাগ লোকই হচ্ছে নাক-বরাবর-দেখনদার—সেদিনও, আজও।

দ্বারকানাথের এই বিবৃতির প্রায় এক বৎসর পরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী কলকাতা সহরের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জন্যে ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি খরিদ করতে দেওয়া হোক এই মর্মে গভর্মেণ্টের কাছে একটি মেমোরিয়াল পেশ করলেন। তার কুড়ি দিন পরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী স-কৌন্সিল গভর্ণর-জেনারল্ যে সব বাধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো ব্যবসায়ীরা তাদের মেমোরিয়ালে সেগুলি দূর করবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ব্যবসায়ীদের মেমোরিয়াল আর স-কৌন্সিল গভর্ণর-জেনারেলের এই প্রস্তাব ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো কম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের কাছে। ধর্মসভা-র নেতৃবৃন্দ কি চুপ থাকতে পারেন যখন রামমোহন ও দ্বারকানাথ ভারতবর্ষে ইংরেজের বসবাস সমর্থন করেছেন! কিভাবে রামমোহন ও দ্বারকানাথ সমর্থন করেছেন, কি তাঁরা বলেছেন, কি সর্ত তাঁরা দিয়েছেন সেগুলি বিচার করে দেখবার প্রয়োজনও তাঁরা দেখলেন না। যা রামমোহন আর দ্বারকানাথ বলবেন বা করবেন তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে হবেই—এই ছিলো ধর্মসভা-র নেতাদের মুখ্য ধর্ম। তাছাড়া এই নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার যাঁদের দৃষ্টি শান্ত আর স্বার্থ এই দুই দেয়ালের বাইরে কখনো যায়নি। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী কলকাতাবাসী ইয়োরোপীয়েরা গভর্মেণ্টের কাছে এ দেশে বসবাস দাবী করে মেমোরিয়াল দিয়েছেন এই খবর এঁদের বিচলিত করে তুললো। তার উপর স-কৌন্সিল গভর্ণর জেনারেল্ এই ইয়োরোপীয়দের দাবী সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এ সংবাদ তাঁদের স্বার্থের শাকের উপর বোঝার আঁটি হোলো। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এঁরা পার্লামেণ্টের কাছে নিম্ন-উদ্ধৃত আবেদন পেশ করলেন—

"To the Honourable the Commons of the United Kingdom of Great Britain and Ireland in Parliament Assembled.

The humble petition of the Zamindars,
Talookdars or Landholders of Bengal.

Sheweth, that your petitioners are exceedingly aggrieved at learning that the British inhabitants of Calcutta has transmitted a petition to be presented to your Honourable House, praying, among other things, for abolishing all the restrictions on the resort of British subjects to, and on their residence in India, in consequence of which your petitioners beg leave respectfully to lay before parliament their grievances for consideration and redress.

That your petitioners are under great alarm, and humbly

declare, that if Europeans (who are not subject to the jurisdiction of the country courts), be allowed to settle in Hindustan, without any restriction, they would spread all over the country and injure the stability of this empire ; for which reason the local government in India was pleased to pass Regulation 38 of 1798, directing that "No European, of whatever nation or description, shall purchase, rent, or occupy, directly or indirectly, any land out of the limit of the town of Calcutta, without the sanction of the Governor-General in Council, and all persons now so holding land beyond the limits of Calcutta, without having obtained such permission in opposition to the repeated prohibitions of government, or who may hereafter so purchase, rent, or occupy land, shall be liable to be dispossessed of the land, at the discretion of the Governor-General in Council, nor shall they be entitled to any indemnification for buildings which they may have erected, or other account.

That in the districts where the indigo-planters and others have in a manner settled themselves, the people are more injured and distressed than in other parts of the country, in consequence of such indigo-planters taking possession of land by force, sowing indigo by destroying rice-plant (which is the cause of diminution in the produce of rice, and dearth of the articles of consumption), detaining cattle of, and extorting money from, poor individuals, whose frequent complaints induced the Indian government to pass Regulation 6, 1823 ; nevertheless, *if they be permitted to hold any zemindary, or landed property here, the native zemindars and their ryots must be unavoidably ruined* (Italics mine—S. T.).

That the natives of India, particularly those whose ranks or superiority of caste, according to the usuage of their tribe or religion, prevents them from going to other destinations of the globe for employment, and from doing any menial duty, work, or trade, have no means of supporting their rank, nor of obtaining any public situation in their native country, the only office of dewan which was left for them, has since been abolished, in consequence of which they have no other means to subsist on than their landed property, which is neither absolutely secure, owing to the enforcement of several regulations of government, especially of the Regulation 1 of 1818, II of 1819, and XI of 1825. Under these circumstances should their real estate, (which is subject to public sale for the recovery of

arrears of revenue etc.) be allowed to be purchased by foreigners, they would inevitably labour under great distress and difficulty for the necessaries of life and for the preservation of their rank and character.

Your petitioners, therefore, most humbly entreat, that the well-known justice of Your Honourable House will kindly be pleased to pay due attention to this their first supplication, and reject the last prayer in the petition of the British subjects above alluded to, which would greatly affect your petitioners' interests and the prosperity of British India, or grant them such other relief as the wisdom of parliament may deem meet and expedient."

এই দরখাস্তের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে নীলকর সাহেবরা গ্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে জমি নিয়ে চাষবাস সুরু করেছে সেখানেই চাষীদের উপর অত্যাচার চলেছে, তাদের ধানের জমি জোর করে দখল করে নীলের চাষ করছে নীলকর সাহেবরা, চাষীদের গরু ছিনচ্ছে, গরু আটকে রেখে পয়সা নিচ্ছে, আর তার ফলে চালের উৎপাদন কমে গেছে ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেছে। তাই গভর্মেণ্ট যদি ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি খরিদ করবার অনুমতি দেন তাহলে চাষীর আর জমিদারের দুর্গতির শেষ থাকবে না। অতএব পার্লামেণ্ট যেন এ অনুমতি না দেন।

আগেই বলেছি যে নীলকর সাহেবরা ঠিক বোষ্টমী রীতিতে চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করছিলো তা কোনো মতেই বলা চলে না। তবে জমিদারেরাও যে বৈষ্ণব-রীতিতে চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন ইতিহাস অন্তত পক্ষে সে সাক্ষ্য দেয় না, আর সেকালের একজন বড়ো জমিদার—দ্বারকানাথ ঠাকুর—তিনিও তাঁর বিবৃতিতে জমিদারদের দুষ্কর্মগুলি ঠিক বৈষ্ণবজনোচিত বলে ব্যাখ্যা করেননি। আর নীলকর সাহেবেরা যে সব যুধিষ্ঠিরের সগোত্র এ কথাও রামমোহন কি দ্বারকানাথ কোথাও বলেননি। নীলকর সাহেবেরা চাষীর জমি ছিনিয়েছে বৈকি—কিন্তু সে মহৎ কাজ তো জমিদারেরা বরাবরই করে এসেছে। নীলকর সাহেবেরা চাষীদের মারধোরও করেছে কিন্তু এ ব্যাপারেও তো তারা গাঁয়ের জমিদার আর তার নায়েব, আমলা, বরকন্দাজের চেলাগিরিই করেছে, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু জমিদারেরা যেখানে চাষীদের বেগার খাটাতো অর্থাৎ তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে পয়সা দিতো না সেখানে যে নীলকর সাহেবরা চাষীদের মজুরী দিতো, হাজার হাজার গরীব চাষী যে নীলকর সাহেবদের কুঠিতে জন-মজুরী করে এমন মজুরী পেতো যা তারা কখনো পায়নি ইতিপূর্বে, গাঁয়ের গরীব মধ্যবিত্তেরাও যে নীলকুঠিতে কাজ করে বেশ দুপয়সা রোজগার করছিলো—এ সব কথা বেমালুম চাপা দেওয়া হোলো। যে সব জায়গায় নীলের চাষ হচ্ছিলো সেখানকার চাষীদের ও মধ্যবিত্তদের অবস্থা যে অন্য জায়গার চাষীদের ও মধ্যবিত্তদের অবস্থার চেয়ে অনেক ভালো ছিলো এটা নিঃসন্দেহ। জমিদারদের ভয়টা ছিলো ঠিক এইখানেই। মজুরী নিয়ে কাজ করতে শিখলে চাষীরা আর তাদের কথা শুনবে না, মুখ বুজে বেগার খাটবে না। এ মর্মান্তিক সম্ভাবনা কি জমিদারদের ব্যথা না দিয়ে পারে! তাই জমিদারেরা বিচলিত, চাষীদের দুঃখে এতো বিগলিত!

জমিদারেরা সেদিন কিন্তু নিঃসঙ্গ সহায়হীন ছিলো না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর

একচেটিয়া বাণিজ্যের সমর্থক ও অবাধ বাণিজ্যনীতির ঘোর দুশমন্ "জন্ বুল্" পত্রিকা জমিদারদের সমর্থনে পঞ্চমুখ হয়ে এগিয়ে এলো। জমিদারেরা এলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের সমর্থনে আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী এলো গ্রামাঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের বসবাসের বিরুদ্ধে, জমীদারদের একচেটিয়া চাষী-লুণ্ঠনের সমর্থনে। বেঙ্গল হরকরা প্রকাশই করে দিলো যে হাড়-পাকা রক্ষণশীল রেভারেণ্ড ডক্টর ব্রাইশ জমিদারদের এই দরখাস্তের প্রেরণা যুগিয়েছেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখের হরকরাতে একটি চিঠি ছাপা হোলো তাতে পত্রপ্রেরক লিখছেন—

"Several of the *wise natives* have been advised by the Rev. —— to present a counter-petition against the former one ; and it is now in the hands of the Rev. gentleman."

ডক্টর ব্রাইশ আর "জন্ বুল্" এতো বেশী চেঁচামেচি করে এর প্রতিবাদ করতে লাগলেন যে সকলেই বুঝলেন যে হরকরা-র অভিযোগটা সত্য। জমিদারদের দরখাস্তের সমর্থনে "জন্ বুল্" বার বার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখ্লো ও নানা চিঠি ছাপালো। সেই সব চিঠিগুলি থেকে বাছাই করে একটি পাকা হাতের লেখা জোরালো ও রসালো চিঠি পাঠকদের সামনে পেশ করি। চিঠিটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯ই জানুয়ারী তারিখের "জন্ বুল্" পত্রিকায় বের হয়েছিলো।

চিঠিটি এই,

To The Editor of the John Bull

My dear Bull,

The ignorance, and at the same time the self-complacency, displayed by the liberals of Calcutta on every subject that they take in hand, is really, to a looker-on, knowing something of the real state of affairs, most disgusting. The Editor of the India Gazette in a very lengthy article published in that paper on Monday last the 11th instant, has entered into a long defence of the Blues, and a disquisition on affairs in the interior, that will be laughed to scorn by every man who has ever been beyond the Mahratta Ditch, or taken a further excursion into the Mofussul, than Tettighar or Barrackpoor—and no body of men will enjoy it more, I believe, than the indigo-planters themselves. It is in short, my dear Bull—Humbug, and a display of ignorance from beginning to end. First—"Indigo Planters are an object of suspicion to the government"!!! Second—"Indigo-planters are regarded by the community as tyrants and oppressors!" Third—"No oppression has ever been established against them!! Fourth.—"An indigo-planter may have occasionally flogged a coolie without sufficient cause"!!! Fifth. "We challenge proof of their tyranny." Sixth—"The share indigo-planters have in disturbances is more nominal than real." Seventh.—"The planters

are involved *almost invariably* without their knowledge." Ninth—"What is so common as the attendance for months and even years of witnesses at a mofussul court before an ordinary case is decided?"!!! Tenth.—"But for planters, the Zemindars' estates would be sold, or remain in the hands of Government." Now all the above ten passages taken indiscriminately from two columns of matter, shew most abundantly the absolute ignorance and folly of the writer, be he who he may ;—and now to the proof—First—when were the indigo-planters objects of suspicion to the Government? Never. Second—"Who states that the indigo planters (taken as a body) are tyrants and oppressors? No one. Third—"No oppression has ever been established against them." This is untrue. I will not allude to more recent cases, but I will take printed parliamentary papers. I find a Mr. Douglas in Zillah Sarun, convicted by the Supreme Court, fined 1000 rupees and sentenced to 12 months imprisonment for a violent affray attended with arson—I find a Mr. Clarke in Zillah Purneah fined 400 rupees and sentenced to 12 months imprisonment for killing a ryot. I find a Mr. Fichburne found guilty of manslaughter, fined 400 rupees and imprisoned 12 months for killing a Gomasta: and I find the same Mr. Fichburne found again guilty of a most wanton and aggravated assault on a native and fined 100 and imprisoned 12 months: I say therefore in contradiction to the Editor of the India Gazette—that oppression has been established against them. Fourth.—"A coolie may be flogged without sufficient cause". Coolies feel I believe as much as other men, and I will thank the Editor of the India Gazette to tell me what he deems a sufficient cause, to warrant or authorize and indigo planter flogging even a coolie. Fifth.—The Challenge I have answered, and shewn above a few instances of their tyranny. Sixth.—"The share the Blues have in disturbances is more nominal than real." The Blues will tell the Editor that they have "more talent" amongst them than to interfere unnecessarily in disturbances——

"Who in quarrels interfere"
"Must often wipe a bloody nose."

Seventh.—"The Zamindrs sows the lands for the planters." I fancy the Blues would be very glad to find that the case. My reading is, "the Zemindars often cut the weed for the planters." The Eighth.—Humbug is the assertion that "the planters are *invariably*

involved without their knowledge." Poor fellows.!! The only way I believe they are involved without their knowledge is in the Books of the "White Baboos" in Calcutta. Ninth.—"Witnesses attend for years"—Oh, for centuries. There is a witness now in attendance at Banglipore, who was there in the time of Warren Hastings and the poor fellow has not been examined yet. Tenth.—"The planters pay all the Government revenues." What kindhearted fellows! There are on an average perhaps three planters in every district throughout India and these good-tempered fellows, support the government, and pay twenty two or twenty three crores of rupees every year to keep the Government afloat, which money is sent up to them by the "Liberal white Baboos" from Calcutta ; all of whom are thick and thin Government men!!! Was there ever such nonsense—such humbug, in this world—and then again "British Skill"—"British Capital"—"British Industry." What is "British Skill?" Why, it is displayed in skillfully humbugging the natives, out of as much money as they can—What is "British Capital?—why, coming to India without one rupee, setting up a House of Agency and borrowing money right and left—What is "British Industry?" Why, living in the finest houses in the place, driving the handsomest equipages, drinking Lal Shrab and Simkin and writing impudent letters to the Poor Blues.

Your obediently
Veritas.

চিঠিটা খুবই উপভোগ করবার জিনিস। লেখকের মুন্সিয়ানা আছে। নীলকর সাহেবদের পিঠে চাবুক মেরে নুন ছিটিয়ে দেওয়ার কায়দাটাও খুব জবর। চিঠিটা থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হচ্ছে যে একই জাতির লোকদের মধ্যে যখন অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষ সুরু হয় তখন ন্যাশানালিজমের সব বাঁধন আল্‌গা হয়ে যায়। তখন একচেটিয়া বাণিজ্যের সমর্থন রক্ষণশীল ইংরেজ অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থক উদারনৈতিক ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করতে এতোটুকুও দ্বিধা করে না। শুধু তাই নয়, তখন দল ভারী করবার মতলবে কালা আদ্‌মীর সঙ্গে জোট বাঁধতেও বাধে না। তাই তো লোকে বলে যে যাদের পকেটগুলো এক সুরে বাঁধা যখনই তাদের স্বার্থে ঘা পড়ে তখনই জাতীয়তার দোহাই, জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মধুর কাহিনী কিছুই তাদের মনের উপর বিন্দুমাত্র দাগ দেয় না, স্বার্থের তৈলসিক্ত মন থেকে সব পিছ্‌লিয়ে যায়। তখন জাতীয়তার বেড়া টপ্‌কে, জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যমায় মুখোস ফেলে দিয়ে এক-পকেটধর্মীরা সব এক হয়ে যায়—কালা, ধলা, পীত, সব এক হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একেই বলা হয়—শ্রেণী-স্বার্থ হচ্ছে জাতীয়তার তলা-ফুটো-করনেওয়ালা। যাই হোক্, শিক্ষিত ও সংস্কৃতদের কোমল হৃদয়ে আর অকারণ ব্যথা দিয়ে লাভ নেই। ইতিহাস এম্‌নিতেই এতো ব্যথা দেয় শিক্ষিতদের, যে তার পরে বিজ্ঞান-

সম্ভূতা ব্যথা দেওয়া নিষ্ঠুরতার সামিল হবে।

জমিদারদের এই দরখাস্ত "জন্ বুল্" পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার কিছু কাল পরে নিম্নলিখিত চিঠিখানি ছাপা হোলো—

To the Editor of the John Bull

Sir,

In your paper of the 25th ultimo, you have favoured us with a draft Petition to Parliament of the Zemindars, Talookdars and other influential natives in Calcutta against Colonization: and although the measure itself is of very doubtful consequence to both Europeans and Natives, if it is to be opposed, it would be desirable to see it done by more candid statements than those made use of by the Native gentlemen, etc.

In the third paragraph it is stated.

"That in the districts where the Indigo Planters and others have in a manner settled themselves, the people are more injured and distressed than in other parts of the country, in consequence of such Indigo Planters taking possession of land by force, sowing indigo by destroying rice-plant (which is the cause of dimunition in the produce of rice, and dearth of the articles of consumption), detaining cattle of, and extorting money from, poor individuals, whose frequent complaints induced the Indian government to pass Regulation 6, 1823 ; nevertheless, if they be permittted to hold any Zemindary, or landed property here, the native Zemindars and their ryots must be unavoidably ruined."

Now admitting that the Natives are oppressed by the Indigo Planters it is evidently not in the manner here described as the merest Tyro in the agriculture of this country must be aware that indigo will not grow on paddy lands and thus if there is a scarcity and dearth of rice as asserted by the native gentlemen, it is more likely to be caused by the increased commerce of the country, than by the oppression of the Indigo Planters.

It is rather startling to observe Regulation 6 of 1823, lugged in as a proof that natives require the particular protection of Government from the oppression of Indigo Planters when the fact is that this very Regulation was framed to assist the Planters against the duplicity of the ryot, by giving them—the Planters—a lien in the crop, and several advantages in prosecuting not possessed before.

It is a wellknown fact that, in the districts where "Indigo

Planters have in a manner settled themselves" the price of labour has been double within the last 15 years, and the rent of land nearly in the same proportion. If there are proofs of increasing poverty in the state or the subject, they are entirely overlooked by every writer, who has hitherto endeavoured to enlighten us on the subject of Political Economy etc., etc.

BEN Block I. P.

Jungle Barru
3rd August, 1828.

এই চিঠিটির তলায় "জন্ বুল্"-এর সম্পাদক এই মন্তব্যটুকু জুড়ে দিয়েছেন—

"We are not quite such marines as our correspondent seems to take us for. We know, on the best authority that the Indigo Planters' assistant, who caught the beating so much spoken of in the papers some time ago, came by it from his being mistaken for a Planter, who had done the very thing complained of in the Petition, viz., seized on paddy lands, to grow his indigo on. See also Bishop Heber's journal on the subject.—*Editor.*

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের "জন্ বুল্" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার বনাম অবাধ-বাণিজ্য—এই বিষয়ে এই ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে—"

"We hear much of what the English manufacturer is to gain by subverting the Company's monopoly. The immense market over which he is to distribute the produce of his industry forms a constant and cunning argument with the anti-monopolists. But let us see what the native facturer is to lose. This is even now no problematical matter. Small as is the extent to which the trade between the two countries has been increased, it has been attended with many very ruinous consequences to the native manufacturer. It will be seen, that the greatest imports from England into India is in cotton goods, so far as native consumption is concerned, almost the only article taken. The advantages of the machinery possessed by England, enable her to manufacture these goods, and with all the expenses of freight and insurance on the raw material first, and the wrought goods afterwards, to undersell the native weaver in his own market. Thousands of native weavers have already, as we all know, been thrown out of employment, and consequently distressed and impoverished by the competition—and may we not in a question of this kind plead their cause as at least as worthy of attention as that

of the Free traders of England."

কি ভালোবাসা বাংলার তাঁতীদের উপর! "জন্ বুল্" স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে বিলিতী কাপড় আমদানী করে বাংলার তাঁতীদের গুঁড়িয়ে দেবার মধুর ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে—

"Thousands of native weavers have already, as we all know, been thrown out of employment, and consequently distressed and impoverished by the competition."

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই সর্বনাশ কে করেছিলো তাঁতীদের? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দ্বারাই বাংলার তাঁতীদের এই সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল। তখন কিন্তু "জন্ বুল্" সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, একবারও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর এই বাণিজ্য-নীতির প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু যেই অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করলেন অম্নি বাংলার তাঁতীদের দুঃখে 'জন্ বুল্'-এর হৃদয় বিগলিত হোলো। অবাধ-বাণিজ্যনীতি গৃহীত হোলে ভারতবর্ষের কি দুর্দশা হবে সেটা ভেবে "জন্ বুল্" রাতের ঘুম মনের শান্তি সব হারিয়ে বসলেন। এটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু মনে রাখা দরকার যে শ্রেণী-স্বার্থের বাষ্পেই অর্থনীতির ও রাজনীতির ইঞ্জিন চলে, আর শ্রেণী-স্বার্থকে জাতীয়-কল্যাণপন্থী ও মানব-কল্যাণপন্থী লেবেল দিয়ে চালিয়ে দেবার সুচতুর পদ্ধতি অতি সনাতন বিধি। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে "জন্ বুল্" জাতে আর ধাতে সনাতনী। বাংলার সনাতনপন্থীদের সঙ্গে "জন্ বুল্"-এর কণ্ঠি-বদলের খবরও আমরা যথাস্থানে দিয়েছি।

কম্পানীর সমর্থক আর একজন বিখ্যাত লোকের কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস" (*Political History of India*) প্রণয়ন করেছিলেন সর্ জন্ ম্যাল্‌কম্। এঁর মনের ধাঁচার হদিশ ছোট্ট একটি তথ্য থেকেই পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ঘোর বিরুদ্ধতা করেছিলেন সর্ জন্। তাই "জন্ বুল্"-এর গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এই লোকটির উপর। "জন্ বুল্"-এর বহু সংখ্যায় অবাধ-বাণিজ্যনীতির বিপক্ষতা করতে গিয়ে "জন্ বুল্" সর্ জন্-এর মতো এমন একটি বিখ্যাত লোকও যে তাঁদের দিকে সে কথা পত্রিকা-সম্পাদক বার বার নানা ছাঁদে প্রকাশ করেছেন। এ হেন সর্ জন্ ম্যাল্‌কম্ তাঁর 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখছেন :—

"Though a desire to defend their exclusive privileges of trade, at one period, have led the Company's government to oppose itself to Europeans proceeding to India, (Italics mine—S. T.) nothing can be more groundless than the accusation recently made against the Court of Directors of having, from an illiberal and short-sighted policy, endeavoured to prevent, by prohibitions and restraints, the settlement of Englishmen in that country. They have on the contrary, permitted their settlement *as far as it was compatible with the welfare of the settlers, the interests of their native subjects and the peace and prosperity of the empire.* (Italics mine—S. T.).

সর্ জন্-এর জবানি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে যদিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মালিকদের একদা মুনাফা-রুচি ছিলো, ও সেই কারণেই অন্য ইয়োরোপীয়দের সেই মুনাফা-লোটার শুচি ক্ষেত্রে ঘেস্তে দিতে তাঁদের তখন বিলক্ষণ অরুচি ছিলো, পরে কিন্তু তাঁরা সেই অরুচি রোগে আর ভোগেননি। ভারতবাসীদের ও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্যেই সেই ইয়োরোপীয়দের যেটুকু বাধা দেওয়া দরকার সেটুকু বাধা তাঁরা দিয়েছেন! এমন উপভোগ্য রসিকতাটুকুর টীকা করে তার রস উবিয়ে দিতে আমি চাইনে।

সেদিন যাঁরা অবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্তনের ও ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের কি বল্‌বার ছিলো সেটি তাঁদেরই সেরা মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। বাংলার জমিদারশ্রেণী আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী সেদিন একজোট হয়ে লড়ছে অবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ও ইয়োরোপীয়দের জমির মালিক হওয়ার প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে। জমিদারেরা লড়ছে, চাষীদের উপর তাদের একচেটিয়া প্রভুত্ব অটুট রাখবার জন্যে; ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী লড়ছে তার একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে। কায়েমি স্বার্থের দেশী ও বিদেশী ভোগকরনেওয়ালা মালিকেরা তখন 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' মহা-মন্ত্রের জোরে এক হয়েছে—মুখে তাদের এক বুলি—ভারতবাসীর স্বার্থ ও চাষীর স্বার্থ বিপদাপন্ন।

[ক্রমশঃ]

আধুনিক সাহিত্য

টমাস মান-এর মৃত্যুতে যাঁরা ভেবেছিলেন ইউরোপের শেষ সংস্কৃতিবান মনীষী চ'লে গেলেন—তাঁরা ভুল করছেন মনে করবার মতো কোনো উপস্থিত প্রমাণ ছিলো না। রুশ কবি পাস্টেরনাকের কথা একটু একটু শোনা যাচ্ছিলো। বছর দুই আগে "নিউ স্টেট্‌সম্যান" কাগজের সাপ্তাহিক সংবাদে পড়েছিলাম—তাঁর লেখা এক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ইতালিতে এসে পৌঁচেছে। আর কিছু না জেনেই খুব কৌতূহল বোধ করেছিলাম, তার প্রথম কারণ রুশদেশ উপন্যাসের হীরের খনি; আর দ্বিতীয় কারণ পাস্টেরনাক। তাঁর অনেক আগেকার লেখা কতিপয় কবিতা পড়েই আশা হয়েছিল যে এই এক নতুন প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। পাস্টেরনাক প'ড়ে জেনেছি টমাস মান-এর সঙ্গে ইউরোপে শুদ্ধ সংস্কৃতির অবলোপ ঘটেনি। এবং তার প্রমাণ এসেছে এমন এক দেশ থেকে যার সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্রোত দূরের দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়েছিল বরফাচ্ছন্ন, গতিহীন।

কবি হলে উপন্যাস লেখা যায় না—এ ধরনের আপ্তবাক্যে আমার আস্থা নেই। গত ষাট-সত্তর বছরের ইতিহাস মনে রেখে অনায়াসেই বলা যায় পৃথিবীর মহত্তম উপন্যাসগুলি উত্তরোত্তর কবিতার লক্ষণে আক্রান্ত হচ্ছে, কবিতার যা চরিত্র তার সঙ্গে ক্রমেই ভেদ ঘুচে যাচ্ছে উপন্যাসের। বুদ্ধিমানদের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয়েছে। কাব্যের মৃত্যু হয়নি। আধুনিক কালে নাটকেই শুধু নয়, উপন্যাসেও সগৌরবে কাব্যের পুনরুত্থান হয়েছে। গ্রহান্তরে যাত্রার অবিশ্বাস্য প্রাক্কালে কাব্যের এই পরাক্রান্ত প্রাণশক্তির জয়যাত্রা দেখার দরকার ছিলো।

কাব্য এবং গদ্যকাহিনীর ভেদ ঘুচে যাওয়া এই শ্রেণীর উপন্যাসে দিনের আলোর চোখে দেখা বিদ্যমান বাস্তবের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখব ব'লে আমরা কেউ আশা করি না। চিত্তবিনোদন কিংবা চারিত্রিক উন্নতি—কোনোটাই তার লক্ষ্যের মধ্যে নেই। কাব্যের সহযাত্রী হয়ে এ ধরনের উপন্যাসও মানব চৈতন্যের শুদ্ধতম প্রকাশ হওয়ার দুরাশা রাখে। এবং সাহিত্যের কোনো রীতিই কখনো প্রাণের গরজ ছাড়া আবিষ্কৃত হয় না। জটিল থেকে ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠছে জীবন। অন্ধকারের পরাক্রম দিনে দিনে আমাদের হতবল, বিমূঢ় করে তুলছে। নিছক গদ্য এলাকার রচনায় এ যুগের শিল্পীক উপলব্ধিকে তাই বিমূর্ত করা অসাধ্য। আভাষে বলতে হচ্ছে, ব্যঞ্জনায় পৌঁছে দিতে হচ্ছে, নিতান্তই খোলাখুলি-ভাবে কাব্যের সেই সব কলকৌশলগুলো ব্যবহার করতে হচ্ছে—যা গদ্যজ্ঞানীর চোখে অভাবনীয়। মহাভারতকারের মতো ছন্দোবন্ধে সমস্তটা লেখার স্বাধীনতা অবশ্য আজ আর লেখকদের নেই। এবং প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিকের পরিচিত উপাদানই তাঁকে ব্যবহার করতে হয়। সব দিক বজায় রাখতে গিয়ে কবিঔপন্যাসিক তাঁর উপাদানকে তাই প্রতীকে পরিণত করেন এবং কাব্যের আলোআঁধারিতে পৌঁছে তখন তাঁর সাহস যে কী অসাধ্য সাধন করতে পারে—কাফ্‌কা, জয়স্, মান-এর সঙ্গে পরিচিত পাঠক সেকথা জানেন।

পাস্টেরনাক কবি, তবে সেই জাতের কবি নন যাঁদের বিহার অমূর্ত কল্পলোকে। আলোকিত প্রত্যক্ষের অঙ্গীকারেই তিনি শিল্পীর গূঢ়তম ধ্যানের উদ্ঘাটনে সমর্থ। ঊর্ধ্বে তাঁর মাথা নক্ষত্র ছুঁলেও পায়ের তলার পরিচিত পৃথিবীর মাটি কখনো ধ্বসে যায় না। তাঁর

নায়ক ডাঃ জিভাগোর শিল্পীক আদর্শও এই রকমের। জিভাগোর মতে :

1. . . . facts don't exist until man puts into them something of his own, some measure of his own wilful, human genius—of fairy tale, of myth. (১১৬ পৃঃ)

2. In his twelve years at school and college (he) had studied the classics and scripture, legends and poets, history and natural science, reading all these things as if they were the chronicles of his house, his family tree. Now he was afraid of nothing, neither of life nor of death ; everything in the world, each thing in it, was named in his dictionary. He felt he was on an equal footing with the universe . . . (৮৭ পৃঃ)

3. Eversince his schooldays he had dreamed of writing a book in prose, a book of impressions of life in which he would conceal, like buried sticks of dynamite, the most striking things he had so far seen and thought about. He was too young to write such a book ; instead, he wrote poetry. He was like a painter who spent his life making sketches for a big picture he had in mind. (৬৮ পৃঃ)

কবিতাতেই শুরু করেছিলেন শেক্সপীয়রও, শেষে নাটকে পৌঁছলেন। পাস্টেরনাক কবিতা থেকে উপন্যাসে। এমন উপন্যাস কঠিনই হয়ে থাকে একথা বলা বাহুল্য। অবশ্য তাঁদের কাছে যাঁরা কবিতায় অজ্ঞাত ম্লেচ্ছ ভাষার আওয়াজ শুনতে পান। কিন্তু যাই হোক আকার অবয়বহীন কাব্যিক উচ্ছ্বাস ব'লে এ উপন্যাসকে কস্মিন কালেও মনে হবে না, কেননা কবিরা সবাই শেলী নন। শেক্সপীরীয় ট্রাজিক নাটক যাদের অধ্যাপ্য না লাগে (এমন লোক আশা করি বিরল নন) পাস্টেরনাকের উপন্যাসের তাঁরা স্বাদ বুঝবেন।

একথার অর্থ এই যে ইউরোপীয় শিল্পরীতির ব্যতিক্রম নন পাস্টেরনাক। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সেই জাতের দুর্দমনীয় প্রতিভা যা নাকি রটিং কাগজের মতো রাষ্ট্রীয় মগজের চিন্তাভাবনাকে শুষে নিতে অসমর্থ। সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতোই শিল্পসৃষ্টিও জীবনের এমনই এক গুরুতর এবং পবিত্র কাজ যে সেই কর্মে, এমনকি, বিশ্ববন্দিত উপদেষ্টাদেরও নিয়োগ করার কথা পাস্টেরনাক ভাবতে পারেন না। তবে সুস্থ পিতাদের মতোই পুশকিন, চেকভ, সফোক্লিস, শেক্সপীয়রের ন্যায় অগ্রজদের কাছে তিনি অল্পাধিক ঋণী। তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী নীরবতাকে আমরা যখন শীতের দেশের কুয়াশা-ঢাকা রহস্য বলেই মেনে নিয়েছিলুম তখন তিনি সত্যি সত্যি নীরব থাকেননি, কুড়ি বছর ধ'রে একান্তে শেক্সপীয়রের রুশ তর্জমা করছিলেন। সে কাজটা শুধুই জীবিকার দায়ে, কিংবা স্বীয় কণ্ঠ খুলতে না পেরে বরং ভিন্ন গলার স্বরলিপি সেধে চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে—একথা আমি ভাবতে পারি না। এসব কারণও যথেষ্ট জরুরী ছিলো হয়তো। কিন্তু বৃহৎ প্রতিভার এটাই লক্ষণ যে সব কাজই তাঁদের স্বকীয় সাধনার বিঘ্ন না হ'য়ে বরং শক্তির উৎস হ'য়ে ওঠে। শেক্সপীয়র ছাড়া গ্রীক নাট্যকারদের অনুবাদেও তাঁর উৎসাহ সমান ছিলো। এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে গ্রীক নাট্যকার এবং শেক্সপীয়রকে তিনি এমন আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করেছেন যে ধরনের ব্যবহার একমাত্র অসামান্য শিল্পীদের হাতেই সম্ভব।

মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে যে বৈশিষ্ট্যের জন্য ঈডিপাস নাটকটিকে আমরা আজ স্মরণ করি—তার সঙ্গে ডাঃ জিভাগোর অবশ্য কোনোই সম্পর্ক নেই। কিন্তু ভবঘুরে দরিদ্র একা মানুষ ঈডিপাস স্ফিংস্-এর মতো দানবের হাত থেকে নগর রক্ষাও করেছিলেন। তারপর অমোঘ নিয়তির দুর্লক্ষ্য বিধানে, তাঁর সব করুণা, ক্ষমা, বীরত্ব, ভালোবাসা নিয়েও হতভাগ্যের মতো রাজ্য থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। নগরী তাকে ক্ষমা করেনি, রক্ষা করেনি। গ্রীসের স্ফিংস্ পাস্টেরনাকের হাতে এশিয়ার ড্রাগনে পরিণত হয়েছে। তার হাত থেকে নগররক্ষার অমোঘ মন্ত্র জানা আছে জিভাগোর। তবু সেই উদাসীন নগরীর কঠোর রাজ-পথেই তাঁর অবহেলিত মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। মস্কোর পথে সর্বস্বান্ত প্রেমিক কবি জিভাগোর সঙ্গে গ্রীক নগরীতে আগন্তুক ঈডিপাসের মিল কিছুতেই ভুলতে পারি না :

. . . '(He) arrived in the Moscow streets dressed in a grey sheep skin hat, puttees and a worn-out army great coat stripped of all its buttons like a convict's overall . . . (৪১৬ পৃঃ)

শুধু দুঃখের দৃশ্য হলে এ সাদৃশ্য না দেখালেও চলতো। কিন্তু এই হতভাগ্যকে দেখে অনুকম্পা নয়, মনুষ্যত্বের প্রতি, বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে আমাদের মনে। ট্রাজেডির নায়ক ছাড়া আর কেউই এভাবে অভিভূত করেন না।

তুলনায় অবশ্য শেক্সপীরীয় কাব্যনাট্য থেকে তাঁর আহরণের পরিণাম অধিক। মানব-ইতিহাসের প্রচণ্ড কোনো তোলপাড়ের প্রতিচ্ছবি প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ব'লে—কার পক্ষে আজ বিশ্বাস করা সম্ভব বলুন? অথচ শেক্সপীয়রে যেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তবু যে তাকে আমরা নাটকের পরিবেশে স্বীকার ক'রে নিই তার কারণ বাস্তবে হেন ঘটনার অস্তিত্ব না থাকলেও কাব্যের ব্যঞ্জনা হ'য়ে—আরো এক গভীর সত্যকে আমাদের চৈতন্যে পৌঁছে দেয়। সত্যিকারের রুশবিপ্লব দেখা মানুষদের নিয়ে গদ্য উপন্যাস লিখতে বসেও প্রকৃতিকে দিয়ে পাস্টেরনাক সেই কাজই যে করিয়ে নিতে পেরেছেন তার কারণ বাস্তবের সীমা অতিক্রম করে তাঁর উপন্যাস কাব্যের এলাকায় ঢুকে পড়েছে। প্রশ্ন করার কথাই আমাদের মনে আসে না, যখন শুনি,

"There was something in common between events in the moral and the physical world, between disturbances near and far, on earth and in the sky . . . ." (১৭৫ পৃঃ)

আমরা সানন্দে মেনে নিই। লেখকের সাহস দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয় যখন দেখি, এমনকি শেক্সপীরীয় অলৌকিকের পর্যন্ত তিনি অনায়াসে ব্যবহার করছেন। উপন্যাসের ১৮২ আর ১৮৭ পৃষ্ঠায় দুটি অচল ঘড়ির আপনা থেকে বেজে ওঠার কথা বলছি। মৃত্যুর ঘণ্টা, সর্বনাশের প্রহর বাজলো।

নিয়তিকে আনতেও সংকোচ করেননি পাস্টেরনাক, যদিও তেমন নিয়তিকে মেনে নিতে হলে বিজ্ঞানের যুগ পেরিয়ে অতীতের দিকে আমাদের মুখ ফেরাতে হয় না। প্রকাণ্ড দেশ রাশিয়া। হাপেরীর সীমান্ত থেকে উরাল পর্বত পেরোনো অতিকায় এই মহাদেশের মধ্যে যে বিপ্লব ঘটে গেল—ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বিপ্লবে ছন্নছাড়া, উদ্ভ্রান্ত এই অতিকায় দেশের প্রকৃতি-মানুষ-গ্রাম-শহর-পশুপাখী-ঋতুপর্যায়-জন্মমৃত্যু-মহামারী-ব্যাভিচার-বীরত্ব-সৌন্দর্য-দুঃখ-নীচতা আর মহত্ত্ব—এই সবটাই যে কাহিনীর উপাদান—সাড়ে চারশো পাতায় আটাতে পারলেও তার গতি মন্থর না হ'য়ে পারে না। এবং সেটা যে লেখকের সচেতন

পরিশ্রমের ফলে রচিত হয়েছে তা অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্য থেকেই স্পষ্ট হওয়া উচিত। একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে ফেলে তারপর আবার মানুষের সমাজকে নতুন ছাঁচে ফেলে অমন ক'রে গড়া যায় না। কেননা মানুষরা কেউ হাতে গড়া কল নয়। সমাজের রূপান্তরের রহস্য বলতে গিয়ে জিভাগো প্রকৃতির কথা ভাবছেন। শীতের উলঙ্গ ডাল বসন্তে একরাত্রির হাওয়া লেগে কেমন সবুজ পাতায় নেচে ওঠে :

"During this transformation the forest moves with a speed greater than that of animals, for animals do not grow as fast as plants ; yet this movement cannot be observed . . . . However much we look at it we see it as motionless. And such also is the immobility to our eyes of the eternally growing, ceaselessly changing life of society, of history moving as invisibly in its incessant transformations as the forest in spring. Tolstoy thought of it just this way but did not say it in so many words. While denying that history was set in motion by Napoleon or anyother ruler or general he did not carry his reasoning to its conclusion. History is not made by anyone. You cannot make history ; nor you can see history, anymore than you can watch the gross growing . . . (৪০৬ পৃঃ)।

এই মন্থর অথচ চিরসজীব প্রাণপ্রবাহের চেতনা জাগাতে গিয়ে কাহিনীর গতিকে লেখক মন্থর করেছেন বলে মনে করি। এটা তাঁর সচেতন চেষ্টালব্ধ। এই মন্থরতার ফলে সহসা আমাদের চোখে পড়ে না হয়তো যে উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনা, উল্লেখ—এমনই আশ্চর্যভাবে সমগ্র কাহিনীর টানাপোড়েনের মধ্যে বিন্যস্ত যেন লেখককে কিছুই করতে হয়নি, ত্রিকালজ্ঞ নিয়তি তাঁর হাত দিয়ে সব করিয়েছে।

উপন্যাসের সুরু মৃত্যু দিয়ে। অস্ফুট আশায় গিয়ে কাহিনীর শেষ হয়েছে। কেননা মৃত্যুকে জয় করাই শিল্পপরচনার উদ্দেশ্য। আর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের এই প্রতীকী কাহিনীতে অগণ্য চরিত্র যারা আসচে যাচ্ছে, ঝলসে উঠছে ক্রিস্‌মাস পার্টির ভিড়ে, বক্‌বক্ করছে ট্রেনের কামরায়, ভোর রাতে রাস্তার রেলিংয়ে বসে মাতলামি করছে মদ খেয়ে, জিভাগোর সঙ্গে সব সময়ে তাদের পরিচয়ও হচ্ছে না হয়তো—কিন্তু তারা কেউ রবাহূত নয়। কাহিনীর জটিল কলে সবাই তারা প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ। ১৫৫ পৃষ্ঠায় কেউ যদি মার্কেলকে জিজ্ঞেস ক'রে থাকে—'মেয়েদের কুশল তো'?—৪২৫ পৃষ্ঠায় এসে সেই মেয়েদের একজনকে তার স্ত্রী হতেই হবে। The Five O'clock Express : উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ। মস্কো শহরের বাইরে ছোটো আর এক শহর। দশ বছরের বালক য়ুরী (জিভাগো) দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে মাঠের ওপারে অসময়ে মাঝপথে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। জানলো না, তার হারিয়ে যাওয়া যে-পিতাকে কোনোদিন সে দেখেনি—ঐ ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন তিনি। পাশের কামরার যাত্রী মিশা গর্ডন। পিতার সহযাত্রী আইনের ব্যবসায়ী কুটিল কোমারোভ্‌স্কি (২৩ পৃঃ), বহুকাল পরে লারার জীবনে যিনি পরম অভিশাপ হ'য়ে দেখা দিলেন (৫০ পৃঃ), এবং শেষ পর্যন্ত লারাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন য়ুরীর হাত থেকে (৪০১ পৃঃ)। অমোঘ নিয়তির নির্দেশে যেন কাহিনীর পাত্যয় ফিরে ফিরে আসছেন মাদমোয়াজেল ফ্লোরি (১২৬, ৪৩৯ পৃঃ), ফিরে আসছে পাশা এ্যান্টিপভ্ (৪১, ৫৪,

৭৯, ৯৩, ১০২, ২২৫, ৪০৯ পৃঃ), ইয়েভ্‌গ্রাফ (১৭৬, ১৮৯, ৪০৪ পৃঃ), ভাসিয়া (২০১, ৪১৯, ৪৫৯ পৃঃ), কাটিয়া/তানিয়া (২৭০, ৪৪৪, ৪৫৭ পৃঃ)। আপাতদৃষ্টিতে এইসব চরিত্রের পক্ষে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই যেন দেখা যায় না। অথচ যখন তারা আসে অমনি আমরা কাহিনীর গূঢ় উদ্দেশ্যের আরো একটা গোপন দরজা খুলে আবিষ্কারের আনন্দে চমকে উঠি।

Dr. Zhivago কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস—একথা বললে যথেষ্ট হোলো না, এ হচ্ছে গদ্যে লেখা সুদীর্ঘ এক কাব্য নাট্য। বহু দৃশ্যে ভাগ করা। এবং যথার্থ নাট্যকারের মতোই এই কাহিনীর লেখকও প্রায় সময় (সমস্ত সময় বলতেই বা দোষ কী?) রঙ্গমঞ্চের বাইরে প্রচ্ছন্ন। নিজের গলায় পাঠককে সম্বোধন ক'রে কিছু বলার চেষ্টা তাঁর নেই। কোনো চরিত্র কিংবা ঘটনা বিষয়েও তিনি বেশ নিস্পৃহ। নিজের ব্যক্তিত্বকে কেবলই মুছে ফেলার চেষ্টা। যেন তাঁর শুধু কাজ হচ্ছে দৃশ্যের বর্ণনা করা, পাঠককে ধরিয়ে দেওয়া—এইবার মস্কোর রাজপথ, কিংবা উরাল অঞ্চলের বনভূমি, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতাল। বাকি গল্পটা চরিত্রগুলির কথাবার্তা, আচরণ থেকেই আমরা বুঝে নিই। এমনকি প্রয়োজনমতো নাটকীয় স্বগতোক্তির ব্যবহারেও তাঁর আপত্তি নেই। Conclusion নামের পরিচ্ছেদে লারার মুখে আমরা যা শুনি তাকে নাটকীয় স্বগতোক্তির অভিনব প্রয়োগ ছাড়া আর কী বলব?

অসংখ্য ছোটোবড়ো দৃশ্যে ভাগ করা এই কাব্যনাটকের গঠন এবং বিষয় নির্বাচন থেকে *Antony and Cleopatra*-র সঙ্গে তার চারিত্রিক মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একদিকে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের মতোই বিপুল রুশদেশ বিপ্লবে টলায়মান। বেঁচে থাকার জরুরী কাজটাকে আপাতত স্থগিত রেখে কঠোর নেতা উপনেতারা যখন ইতিহাসকে ঢেলে সাজতে গিয়ে জীবনের সব কিছু মূল্যবান বস্তুকে বিসর্জন দিচ্ছেন—একা মানুষ জিভাগো তখন, শেক্সপীরীয় নাটকে যেমন এ্যান্টনী, ভালোবাসার পরম অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হ'য়ে যাচ্ছেন। ('The nobleness of life is to do thus') স্ত্রীপুত্র ছেড়ে গেছে, বন্ধুরা বুঝতে পারেন না। এ্যান্টনীর মতোই একা তিনি, পরিত্যক্ত, সামাজিকভাবে অসহায়। শেষ পর্যন্ত লারাকেও যে আঁকড়ে থাকতে পারবেন তার ভরসা নেই :

1. 'I am jealous of Komarovsky, who will take you away from me some day, just as certainly as death will someday separate us.' (৩৬০ পৃঃ)

2. Yury felt that . . . he would inevitably lose her and with her the will to live and perhaps life itself' (৩১৪ পৃঃ)

(এ্যান্টনী বলেছিলেন— 'Unarm, Eros, the long day's task is done, and we must sleep.')

উভয়কেই নির্ভয়ে মৃত্যুর জন্য তৈরি হ'তে হয়, যে মৃত্যু অমরতার সিংহদ্বার। তার আগে জিভাগোকে কবিতা লিখতে হবে, নাটকের নির্ধারিত সীমার মধ্যে, কবি হলেও, যার প্রমাণ দেওয়া এ্যান্টনীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এ্যান্টনীর হ'য়ে শেক্সপীয়র সে দাবী মিটিয়ে দিয়েছেন।

তারপর মৃত্যু হোলো জিভাগোর। কিন্তু ট্রাজেডির সেখানে শেষ হয় না। তার পরেও যথারীতি ধীর গতিতে পৃথিবীর প্রাত্যহিক কাজ চলতে থাকে। ইয়েভ্‌গ্রাফ আর লারাকে জিভাগোর কাগজপত্র থেকে তাঁর লেখা কবিতা সম্পাদনায় বসতে হয়।

কাব্যের গুণ আছে বলেই আবিষ্কার করতে পারি—লারা শুধু এ্যান্টিপভের স্ত্রী, কাটিয়ার মা, জিভাগোর প্রেয়সী নয়—তার মধ্যে রাশিয়ার সত্তা মূর্ত নিয়েছে, সে নারী, সে প্রেম, বেঁচে থাকার পরম মূল্য। জীবনের কোথাও যখন ছন্দ নেই, মিল নেই, বেঁচে থাকার অর্থ গেছে হারিয়ে—তখনো যদি প্রেমের বন্যায় ডুবে যাওয়ার মতো মানুষ না থাকে পৃথিবীতে —প্রেমতো তাহলে বিলাসিতা, মোহিনী প্রকৃতির মায়া শুধু। জিভাগোর কাহিনী এ কথাই আমাদের বলে যে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হলে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, জল আর খাদ্য ছাড়া প্রেমও অপরিহার্য। কেন ঐ উন্মাদের মতো ভালোবেসেছিলেন লারাকে?

1. 'It was not out of necessity, that they loved each other, 'enslaved by passion', as lovers are described. They loved each other because everything around them willed it, the trees and the clouds and the sky over their heads and the earth under their feet (৪৪৭ পৃঃ)

2. 'Everything established, settled, everything to do with home and order and the common round, has crumbled into dust and been swept away in the general upheaval and reorganisation of the whole society. The whole human way of life has been destroyed and ruined. All that's left is the bare, shivering human soul, stripped to the last shred, the naked force of the human psyche for which nothing has changed because it was cold and shivering and reaching out to its nearest neighbour, as cold and lovely as itself. (৩৬২ পৃঃ)

—তাই প্রেম, যার মূর্ত প্রতিমা লারা এ্যান্টিপভ্। অন্ধকারের কোমারভস্কিরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, ড্রাগনের বিষাক্ত ফণা দুলে ওঠে তার কাঁধের উপরে। বাঁর অশ্বারোহী তার একমাত্র বর্শা নিয়ে ছুটে আসে, তাকে উদ্ধার করবে। (কে সেই মেয়ে? রাণী? কৃষাণী? রাজকন্যা?) ঘোড়ার খুরে ড্রাগনের দেহ পিষে যায়। কন্যা অচেতন। ক্লান্ত বাঁর মূর্ছায় ঢলে পড়ে। ওরা কি জাগবে না? আর কতকাল?

Eyes closed.
Hills. Clouds.
Rivers. Fords.
Years. Centuries.

রুশবিপ্লব উপলক্ষ্য মাত্র। এ কাহিনীর মর্ম সমগ্র মানুষের পক্ষেই প্রকারান্তরে সত্য আজ।

টমাস মানের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের শেষ আলো নিভে যায়নি। পাস্টেরনাক আছেন। *Dr. Zhivago* এ শতাব্দীর মহত্তম উপন্যাস। পাস্টেরনাকের প্রতিভা আর যে কবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তিনি শেক্সপীয়র।

নরেশ গুহ

Dr. Zhivago *By* Boris Pastarnak. Collins, London. 21*s*.

সমালোচনা

Selected Poems of Gabriela Mistral. Translated *by* Langston Hughes. Indiana University Press. Bloomington. $3.00.

১৯৪৫ সালে গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ইংরেজীতে তাঁর রচনা অনুবাদ হয়নি বলে তিনি আমাদের নিকট প্রায় অপরিচিতা। এই তের-চোদ্দ বছরে এখানে-ওখানে তাঁর দু'একটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ চোখে পড়েছে। এতদিনে এই প্রথম মিস্ত্রালের কবিতার একটি সঙ্কলন ইংরেজী ভাষায় পাওয়া গেল। য়ুরোপের অন্যান্য ভাষায় মিস্ত্রালের কবিতা বহু পূর্বেই অনুবাদ হয়ে সমাদর লাভ করেছে।

মিস্ত্রালের একান্ত আত্মমুখ কবিতা উপলব্ধির জন্য তাঁর জীবনের একটু পরিচয় জানা প্রয়োজন। চিলির ছোট একটি গ্রামে ১৮৮৯ সালে গ্যাব্রিয়েলা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন পাঠশালার শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকতা অপেক্ষা তিনি বেশী ভালোবাসতেন চারপাশের গ্রামের আসরে স্ব-রচিত গান গাইতে। এটা ছিল তাঁর নেশা। এর প্রভাব মেয়ের উপরও পড়েছিল।

গ্যাব্রিয়েলা নিজেও কিছু দূর পড়াশুনা করে শিক্ষকতা শুরু করলেন। সামান্য বেতন। কিন্তু দরিদ্রের সংসারে এই অল্প আয়েরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পড়া শেখানো সহজ করবার জন্য গ্যাব্রিয়েলা ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট ছোট কবিতা রচনা করে দিতেন। তাঁর কবি-জীবন এভাবেই শুরু হয়।

গ্যাব্রিয়েলা তখন বিশ বছরের তরুণী। বাড়ি থেকে কিছু দূরে ছোট একটি গ্রাম্য স্কুলে চাকরি করেন। ওখানকার এক রেল-কর্মীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। রোমেলিও উরেতা নাম। এই পরিচয় গভীর প্রেমে পরিণত হতে দেরী হল না। গ্যাব্রিয়েলা উরেতাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। সন্তান-সন্ততিপূর্ণ সংসারের কল্পনা তাঁকে তন্ময় করেছে। কিন্তু উরেতা অকস্মাৎ অজ্ঞাত কারণে একদিন আত্মহত্যা করে সে স্বপ্ন নিষ্ঠুরভাবে ভেঙ্গে দিল।

গ্যাব্রিয়েলা জীবনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হবার পর আর বিয়ের কথা ভাবতে পারেননি। শিশুদের শিক্ষা নিয়েই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতার খ্যাতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৫৭ সালে গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল পরলোক গমন করেন।

উরেতার মৃত্যুর আঘাত গ্যাব্রিয়েলার কবি-প্রতিভা বিকাশের মুখ্য প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। প্রথম দিকের রচনায় ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার বেদনা এবং হৃদয়ের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা এমন সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে গ্যাব্রিয়েলার নিজেরই আশঙ্কা হয়েছিল যে এর জন্য তাঁর চাকরির ক্ষতি হতে পারে। তাই তিনি আসল নাম গোপন করে ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল। তাঁর পিতৃদত্ত নাম লুসিলা গদয় ইয়ু আল্‌কায়াগা।

কিন্তু ছদ্মনামের নীচে আসল নাম চাপা পড়ে গেছে।

আলোচ্য সংকলনে কবির বাৎসল্যরসের এবং মাতৃত্বের বিভিন্ন অবস্থার উপর রচিত কবিতা প্রাধান্য লাভ করেছে। এটা স্বাভাবিক। মিস্ত্রাল যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সেখানে তিনি মা। মাতৃত্বের আবেশে তিনি তন্ময়। নিজের বাইরে তাঁর নিকট প্রধান হয়ে উঠেছে সন্তান এবং শিশুর জগৎ। তাঁর কবিতা প্রধানত সন্তান ও জননীর বিভিন্ন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত। মাতৃত্বানুভূতির যে আবেগময় বিচিত্র প্রকাশ মিস্ত্রালের কবিতায় দেখতে পাই তা অন্য কোনো কবির রচনায় আছে বলে জানি না। একটি দুটি কবিতায় থাকতে পারে; কিন্তু মূলত এই একটি অনুভূতিকে কেন্দ্র করে কাব্য সাধনার এবং কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার দৃষ্টান্ত মনে পড়ে না। সুতরাং সংকলনে মিস্ত্রালের এই বৈশিষ্ট্যের উপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঠিকই করা হয়েছে। অন্য বিষয়ের যে ক'টি কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তুলনায় তাদের ম্লান মনে হয়;—একমাত্র Absence কবিতাটিকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা যেতে পারে।

উরেতার মৃত্যুর পরে মা হবার আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ব্যর্থতার আর্তনাদ তাঁর প্রথম রচিত কয়েকটি কবিতায় ফুটে উঠেছে। Poem of the Son এ দিক থেকে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কবিতার প্রথম তিনটি পংক্তি এই :

A son, a son, a son! I wanted a son of yours
and mine, in those distant days of burning bliss
when my bones would tremble at your least murmur
and my brow would glow with a radiant mist.

I said *a son*, as a tree in spring
lifts its branches yearning toward the skies,
a son with innocent mien and anxious mouth,
and wondering, wide and Christ-like eyes.

His arms like a garland entwine around my neck,
the fertile river of my life is within him pent,
and from the depth of my being over all the hills
a sweet perfume spreads its gentle scent.

আবার সন্তানধারণক্ষম যৌবনপুষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে হতাশাকে মেনে নিতে মন রাজী হয় না :

Oh, no! How could God let the bud of my breasts go dry when
He himself so swelled my girth? I feel my breasts growing,
rising like water in a wide pool, noiselessly. And their
sponginess casts a shadow like a promise across my belly.
Who in all the valley could be poorer than I if my breasts
never grew moist?

Like those jars that women put out to catch the dew of night,
I place my breasts before God. I give Him a new name, I call
Him the Filler, and I beg of him the abundant liquid of life.
Thirstily looking for it, will come my son.

মিস্ত্রাল যৌনানুভূতির কবি নন। তাঁর কবিতায় নারীর প্রিয়ার রূপ কদাচিৎ দেখা যায়; মাতৃত্বের রূপই সর্বত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। সন্তান ধারণ করে বলেই দেহের মূল্য। মাতৃত্বের স্পর্শে দেহ নতুন মর্যাদা লাভ করে :

He kissed me and now I am someone else; . . . .
. . . Now my belly is as noble as my heart.

এর পরে কবির মধ্যে আর আক্ষেপের সুর পাওয়া যায় না। তিনি নিজেকে মায়ের স্থলাভিষিক্ত করে মাতৃত্বের বিভিন্ন রূপের ছবি এঁকেছেন। মা'র মনে সন্তানকে কেন্দ্র করে কত আশা ও আশঙ্কা দেখা দেয়! মিস্ত্রাল তাদের দক্ষতার সঙ্গে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। জন্মের পূর্ব পর্যন্ত মা'র মনে কেবল ভাবনা সন্তান না জানি কেমন হবে। সন্তান জন্মাবার পরে তার লাবণ্য দেখে মায়ের হৃদয় মুগ্ধ। এত দিনে বোঝা গেল প্রকৃতি তাকে এমন করে প্রস্তুত করে তুলেছে কেন :

Now I know why I have had twenty summers of sunshine on my
head and it was given me to gather flowers in the field.
Why, I once asked myself on the most beautiful of days,
this wonderful gift of warm sun and cool grass?

Like the blue cluster, I took in light for the sweetness
I am to give forth. That which is deep within me comes
into being, drop by drop, from the wine of my veins.

সন্তানের মঙ্গল-কামনায় স্বামীর স্পর্শ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেও মা'র মনে দ্বিধা নেই :

Husband, do not embrace me. You caused it to rise from the
depths of me like a water lily. Let me be like still water.

স্বামী এই ত্যাগের পুরস্কার পাবে। সন্তানের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করবার সুযোগ হবে :

I, so small, will
duplicate you on all the highways. I, so poor, will give
you other eyes, other lips, through which you may enjoy the
world; I, so frail, will split myself asunder for love's
sake like a broken jar, that the wine of life might flow.

এখন তো আমি আর প্রিয়া নই, মা হতে চলেছি; সুতরাং :

Do not roughly stir my
blood; do not disturb my breathing.

Now I am nothing but a veil ; all my body is a veil beneath which a child sleeps.

অবৈধ সন্তানের জননীর প্রতিও কবির গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের অনুশাসন দিয়ে তিনি মাতৃত্বের বিচার করতে চাননি।

এই সঙ্কলনে কতকগুলি সুন্দর ঘুমপাড়ানি গান আছে। কিন্তু প্রায় সব কবিতাই গদ্যে অনুবাদ করা হয়েছে বলে মূল কবিতার ধ্বনিমাধুর্য নেই। মৃত্যুর উপরে রচিত তিনটি সনেট বাদ দেওয়ায় সঙ্কলনের মূল্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই তিনটি সনেট দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ ভাষাভাষীদের নিকট সুপরিচিত; এবং এই তিনটি সনেট লিখেই মিস্ত্রাল কবিখ্যাতি লাভ করেন।

নানা বাদ-প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে এই ক্ষুদ্র সঙ্কলনটি নিঃসন্দেহে নতুন সুর নিয়ে এসেছে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোর আকাশ—সুশীলকুমার গুপ্ত। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

নামকরণের মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, কবিতাগুলির মধ্যে তা স্পষ্টীকৃত হয়েছে। সাত বছর আগে যখন সুশীল গুপ্তর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "রৌদ্র-জ্যোৎস্না" বেরিয়েছিল, তখন কবির জীবনবোধ এবং তার কাব্যিক প্রকাশের মধ্যে একটু অস্পষ্টতা, কিছুটা আলোছায়ার সঙ্করতা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু "আলোর আকাশ"-এ সে অস্পষ্টতা নেই। বর্তমান গ্রন্থের কবিতা-গুলির মধ্যে একটি জীবন-নিবিড় কবিমানসের ঋজু প্রকাশ এবং মনন-চিন্তনের সঙ্গে ভাষার সহজ সাযুজ্য আমাদের মুগ্ধ করে।

এই কাব্যগ্রন্থের স্থায়ীভাব প্রেম। সামান্য কয়েকটি কবিতাকে বাদ দিলে, সমগ্র গ্রন্থেরই একাগ্রতা সেই চির-রহস্যময়ী নায়িকার দিকে,

চিনেও চিনি না তাকে। অথচ সে ছায়ার গুণ্ঠন
সরিয়ে দেখায় তার রামধনু-আঁকা মেঘ মুখ :
উঠানে বাতাবিলেবু গাছে ঠেস দিয়ে স্বিপ্রহরে
রূপসী রোদের গল্প পড়ে,.....

কিন্তু নিছক রূপোল্লাসজাত প্রেম নয়, বোধের মধ্যে বিন্দু বিন্দু বেদনা দিয়ে গড়ে উঠেছে এই প্রেমের প্রতিমা। অসমতল জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে কবির সৌন্দর্যাভিসারিক চেতনা পদে পদে আহত হয়েছে, তাই একটি বিষুবরেখাতেই জীবনের মৌল সুর বেদনার আবহ রচনা করে বারে বারে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই করুণ কোমলতা এবং বিষণ্ণ বাঁকার পিছনে যদি গভীর প্রত্যয় ও সৎ পরিণামী বিশ্বাস অটুট না থাকতো তাহলে সেই নৈরাশ্যচারিতার মধ্যে প্রত্যাশা করবার মত কিছু দেখতে পেতাম কিনা সন্দেহ। "আলোর আকাশ"-এর মধ্যে একটি পরম বিশ্বাসের ছবি রয়েছে, একটি মাত্র পংক্তিতেই তার চরিত্র বোঝা যায়, 'ভাবি—মৃত্যু কতটুকু, তার চেয়ে ঢের বড় তুমি!'

সুশীল গুপ্তর কবিতা চিত্রল, উপমায় রূপকে চিত্রকল্পে আগাগোড়া রচনায় চিত্রবহতা লক্ষণীয়। কবিতা পড়তে পড়তে মনে দোলা লাগে এমন বহু পংক্তি, যাদের গঠন-চমৎকারিতা ও ঔজ্জ্বল্য আকৃষ্ট করে, আমরা পেয়ে যাই। এমন কি, স্থির চিত্রের পর স্থির চিত্র সংলগ্ন করেই তিনি সেগুলোর দ্রুত সঞ্চালন দেখান নি, কখনো কখনো তাঁর দু-একটি চিত্রকল্প চলচ্চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু এইখানে একটি কথা থেকে যায়, শব্দের মোহ মধ্যে মধ্যে কবিকে অভিভূত করে ফেলে মনে হল। ফলে সমাবেশরীতিতে অনবধানতা প্রকাশ পায়। যখন তিনি বলেন,...'সবুজ প্রান্তরে বাছুরের মত হাওয়া খেলা করে, কখনো ঘুমায়'; কিংবা...'জ্যোৎস্নার বাটালিতে কুঁদে কুঁদে আঁধারের গুহার অন্তরে স্মৃতিমূর্তি গড়া', অথবা 'কপোত-সথার গলা ধরে ডাকে বকম বকম', তখন সমগ্র কবিতার রূপ-পরিপ্রেক্ষিতে 'বাছুর', 'বাটালি', 'বকম বকম' আমাদের আধুনিক সংস্কারে ঈষৎ পীড়া দেয়। সুশীলবাবুর অনেকগুলি কবিতায়ই রূপকের বাহুল্য নজরে পড়ল। একটি জায়গায় বিশেষ করে পর পর তিনটি পংক্তির শুরুতে 'বাসনার রাত্রি ঘরে', 'হৃদয়ের নীলনদে', 'আশার প্রবাল দ্বীপ' রয়েছে। এই উচ্ছ্বাস কবিতাকে হাল্কা করে দেয়, ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত এই রূপকবাহুল্য আধুনিক কবিতায় বেমানান এবং অতিকথন দোষ-দুষ্ট বলে মনে হয়।

ছেচল্লিশটি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতাই অক্ষরবৃত্ত পয়ারে লেখা, দ্বিতীয় কোন ছন্দ তিনি "আলোর আকাশ"-এ গ্রহণ করেন নি। এটি বোধ হয় এ যুগের একটি অবচেতন বিষণ্ণতার লক্ষণ, সমকালীন বহু কবির মধ্যেই এটি সংক্রামিত। মাত্রাবৃত্ত বা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ কেন যে তাঁদের ভাবের বাহন হতে পারছে না, সে বিষয়ে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

আনন্দ বাগচী

সিপাহী থেকে সুবাদার—সুবাদার সীতারাম। অনুবাদ : শোভন বসু। মিত্র ও ঘোষ। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

সুবাদার সীতারামের এই আত্মচরিত ১৮৫৭-র পূর্বের ও তৎসাময়িককালের ফৌজী জীবন জানবার পক্ষে এক অপরিহার্য দলিল বললে বেশি বলা হবে না। বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য এতই বেশি। সীতারাম জন্মেছিলেন ১৭৯৭ সালে। অযোধ্যা জেলার ভিলুই গ্রামে, গঙ্গাদীন পাঁড়ের ঘরে। আর ১৮৮০ সালে এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক, অনুবাদটির দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে লিখছেন—

'I believe the old Soobadar is dead ; I do not see his name in the army list now,' . . .

সীতারাম নিজেও লিখেছেন, যে এই গ্রন্থে তাঁর ফৌজী জীবনের আটচল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হল। সেই সময়ে কি অবস্থায় কৃষকরা ফৌজে যোগ দিত, সেখানে ইংরেজের হাতে তারা কি ব্যবহার পেত, সমাজ কি সঙ্কীর্ণ ছিল, দেশের আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি নিয়ম শৃঙ্খলা কি রকম ছিল সীতারামের বইখানি তার-ই পরিচয় বহন করে।

সীতারামের আত্মকাহিনীকে জানতে পারি কোম্পানীর ফৌজে যোগ দেওয়া সম্পর্কে

মানুষের মনে ভীতি ও অবিশ্বাস দুই-ই ছিল। সীতারামের ক্ষেত্রে তাঁর মামা, জমাদার হনুমান-এর সোনার দানা বসানো মালা এবং সোনার বোতাম বসানো জামার প্রতি প্রলোভন ছিল। তাঁর ধারণা ছিল মামার কাছে অফুরন্ত মোহরের ভাণ্ডার আছে এবং কোম্পানীর চাকরি-ই এই ঐশ্বর্যের উৎস। সীতারাম ফৌজে যোগ দেন আনুমানিক ১৮১৪ সালে। সে সময় কোম্পানীর ফৌজ হলে আদালতে মামলা মোকদ্দমার সুবিধে হত। সাধারণ মানুষ সে সুবিধে পেত না। দেশে ঠগীদের উপদ্রব ছিল। পিণ্ডারী দস্যুরা ভয়াবহ অত্যাচারে গ্রামবাসীদের তটস্থ রাখতো। ধর্মের অনুশাসন কড়া ছিল। তার খেসারত সীতারামকে দিতে হয়েছে। আবার পরে দস্যু-অপহৃতা একটি সুন্দরী মেয়েকে তিনি বিয়ে করলে পরে সে স্ত্রীকে গ্রহণ করা বিষয়ে কোনো গোলমাল হল না। মুসলমানদের সঙ্গে আহার ব্যবহারে জাত বারবার যেতো এবং গ্রামের পুরোহিতদের সাহায্যে সেই হৃত সম্পত্তি আবার পাওয়া যেত।

"সিপাহী থেকে সুবাদার"-এ ফৌজীজীবন ও সাহেবদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সাহেবদের সম্পর্কে গ্রামবাসীদের ধারণা পরিষ্কার ছিল না। সীতারাম যদিচ প্রভুভক্ত ছিলেন এবং যদিও ইংরেজদের সব দোষত্রুটির কারণ দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন, তবুও অনেক সত্যই প্রভাসিত হয়। ইংরেজ সিপাহীদের হয়ে ভারতীয় সিপাহীরা গরমের সময় পাহারা দিত, মদের পিপে আগলে রাখতো, সময়ে খাবার-ও দিত। কিন্তু পরিবর্তে তারা কালা শূয়ার এবং সমগোত্রীয় কথা ব্যবহার করত। সীতারাম-ই বলেছেন—"যত তাড়াতাড়ি তারা এইসব গালাগালি শেখে তত তাড়াতাড়ি যদি লেখাপড়া শিখতো তাহলে পণ্ডিত হয়ে উঠতো। সাহেবরা হিন্দুস্থানী পরীক্ষায় পাস করেন, বইও পড়েন। সে শুধু নামমাত্র। কার্যত তাঁরা গালাগালি ও চাকরবাকরদের সঙ্গে ব্যবহার্য ইতর ভাষা শেখেন এবং সেই ভাষাতেই আমীর (ভদ্রলোক)-দের সঙ্গেও কথা বলেন। যাঁরা তাঁর অধীনে কাজ করছে, সেই সব সিপাহী বা উচ্চপদস্থ ভারতীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে অধিকাংশ সাহেবই লজ্জা বোধ করেন।" সীতারাম বারবার 'কালা আদমী' কথাটি ব্যবহার করেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না শাসক জাতির মুখে কথাটি ছিল বাঁধাবুলি।

সীতারাম নিজে নেপাল যুদ্ধ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, প্রথম আফগান যুদ্ধ, শিখ যুদ্ধ, বিদ্রোহী সাঁওতালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সর্বশেষে ১৮৫৭-র যুদ্ধে লড়েছেন। যদিও তিনি প্রাক্-১৮৫৭ সময়কার ইংরেজ অফিসারদের ব্যবহারের কিছু প্রশংসা করেছেন, তবুও তাঁর বন্ধু কথাটিতেই এ কথা বোঝা যায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে শুধু গুরুতর ব্যবধান-ই ছিল তাই নয়, আরো ছিল ঘৃণা এবং নিজেদের সম্পর্কে গগনচুম্বী ধারণা। সিপাহীদের তনখা ছিল সামান্য এবং তাদের বড় বড় যুদ্ধে যাবার আগে যে সব পুরস্কার বা তলব বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত সেগুলি রাখা হত না। চল্লিশ বছর ফৌজে চাকরি করলে তবে সুবেদার হওয়া যেতো। ফৌজে উন্নতির আশা ছিল না। ফৌজ ছাড়বার সময় অনেককে অনুর্বর বাজে জমি দেওয়া হত। সীতারামের প্রভুভক্তি ও আনুগত্য এত গভীর ছিল যে ১৮৫৭-তে তাঁর বড় ছেলে অনন্ত পাণ্ডের নির্ভীক মৃত্যু দেখেও সীতারাম সারাজীবন সেই ছেলের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে অনুশোচনা করেছেন। বস্তুত ১৮৫৭-এ দেশবাসীর ব্যবহারে তাঁর লজ্জার সীমা ছিল না। এই অভ্যুত্থান দমন কালে ইংরেজদের বর্বর অত্যাচার সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বলেন নি। তথাপি বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছ থেকে 'আহাম্মুক', 'গাধা', 'বুড়িয়া' শুনতে হয়।

বইখানিতে ইংরেজ আর্মি অফিসারদের অবহিত হবার মতো প্রচুর তথ্য রয়েছে। যে জন্য প্রথম সংস্করণের সময়ে ইংরেজী অনুবাদক লেঃ কর্ণেল নরগেট বলেছেন—

'For the opinions contained in the work, I am not responsible: they are those of a Hindoo, not a Christian.'

ইংরেজী অনুবাদটি দুষ্প্রাপ্য। বাংলা অনুবাদ তথ্যানুগ। তবে একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হল। সীতারাম মূল বই ১৮৬১ সালে হিন্দীতে লেখেন এবং তা একান্তই নরগেট সাহেবের অনুরোধে। বইখানির অনেক প্রশংসাই নরগেটের প্রাপ্য। তখনই এর ইংরেজী অনুবাদ হয়। সে অনুবাদ কোন ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে যে ১৮৬১ সালে *The Times* লেখেন—

'It would be well if all officers whose lot compels them to serve with native troops were to study this life of the Soobadar.'

লাহোরে ভিক্টোরিয়া প্রেসে ১৮৭৩ সালে এর প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ১৮৮০ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত ডি. সি. ফিলট এই চিত্তাকর্ষক কাহিনীটিকে ছাত্রদের পাঠের সুবিধার জন্য মৌলভী রেজা আলি ওয়াসাত-এর সহযোগিতায় কথ্য উর্দুতে অনুবাদ করেন। ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বরে এই উর্দু অনুবাদ "ফৌজী অখবর"-এ বেরোয়, পরে এটি উর্দু পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তখন ফিলট সাহেব নরগেটের বইটি পুনর্মুদ্রণ করেন। সেই বই কলকাতা থেকে ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়।

মূল অনুবাদক নরগেট সম্পর্কে সামান্য পরিচয় থাকা উচিত ছিল। ডক্টর সুরেন সেনের ভূমিকা বইখানির মূল্য বাড়িয়েছে।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

Notes on Andre Gide *By* Roger Martin du Gard. Translated *by* John Russell. Andre Deutsch. *9s. 6d.*

মাত্র এক-শো সাত পাতার বইয়ে আঁদ্রে জিদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে দু-গার যে আশ্চর্য নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা বড় একটা মেলে না। ছবির উপমা দিয়ে বলা যায়, বইটি আঁদ্রে জিদের তেল-রঙে আঁকা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি নয়, পেনসিল কিংবা পেন-অ্যাণ্ড-ইঙ্কে স্বল্প রেখায় আঁকা চিত্তস্পর্শী রেখাচিত্র। কয়েকটি স্মৃতির টুকরো, কিছু স্বীয় মন্তব্য, জিদের কয়েকটি উক্তি—এই সামান্য উপাদানে রচিত এ বইয়ে রজার তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। জিদ সম্পর্কিত স্মৃতিকথা জাতীয় যত বই বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটিকে নিঃসন্দেহেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক আকর্ষণীয় বলা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, জিদকে জানার পক্ষে তাঁর "জার্নাল" এবং ক্ষুদ্রকায় এই বইটির সহযোগ বাঞ্ছনীয়।

জিদের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা নেহাত নগণ্য ছিল না, কিন্তু তাঁর সেই বহু বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে রজার মার্তিন দ্যুগার ছিলেন তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও প্রিয় সুহৃৎ। জিদের জার্নাল

থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১৩ থেকে ১৯৫১ সাল—জিদের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত—রজার ছিলেন তাঁর নিত্যসহচর, তাঁর সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিষাদের সমান অংশীদার। রজারকে ছাড়া তিনি যেন এক মুহূর্তও চলতে পারতেন না, প্রত্যেকটি লেখা রজারকে শুনিয়ে প্রকাশ করতে দিতেন, যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই রজারকে ডাকতেন তার সমাধানে সাহায্য করতে, কোন লেখা সম্পর্কে কেউ বিরূপ সমালোচনা করলে রজারকে তার প্রতি-সমালোচনা করে মনের ভার লাঘব করতেন। অন্যান্য লেখকদের মতো জিদও নিজের রচনার বিরূপ সমালোচনায় কাতর হয়ে পড়তেন, কিন্তু রজারের সমালোচনা—সে যত বিরূপই হোক না কেন—তাঁকে কখনো আহত করতো না। রজারের সঙ্গে আলোচনা না করে, রজারের মতামত না নিয়ে তিনি কখনো বই ছাপতে দিতেন না।

আঁদ্রে জিদের অন্তরঙ্গ—বলা যায় অন্তরঙ্গতম—বন্ধু রজার মার্তিন দুগার যখন তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিকথা রচনা করেন তখন তা অবশ্যপাঠ্য হয়ে ওঠে। কারণ প্রায় চল্লিশ বছর যিনি জিদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই জিদ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য খবরাখবর পাওয়া স্বাভাবিক, জিদের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে হলে তাঁর রচনাই সর্বাগ্রে বরণীয়।

যদি কেউ মনে করেন, যেহেতু রজার জিদের নিত্যসঙ্গী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, সুতরাং জিদ সম্পর্কে তাঁর লেখা পক্ষপাতিত্বযুক্ত বা একপেশে হবে, তাহলে তিনি ভুল করবেন। কারণ প্রথমত রজার সে জাতের বন্ধু নন। দ্বিতীয়ত তিনি স্বয়ং সাহিত্য-স্রষ্টা, *Les Thibault* এবং *Jean Barois*'-এ তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর বিদ্যমান; তিনি জানেন, আলোর সোনালির সঙ্গে ছায়ার কাজলের মেল-বন্ধন ঘটলেই চরিত্র-চিত্র অনির্বচনীয়তায় মুখর হয়ে ওঠে, অন্যথায় পৌত্তলিক নিষ্প্রাণতা তাকে পাঠকচিত্ত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

তাই রজার তাঁর '*Notes . .*' -এর কোথাও আঁদ্রে জিদকে মহত্তম সাহিত্যিক বা গুণীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করতে চাননি। প্রায় চল্লিশ বছরের দীর্ঘ বন্ধুত্বে মধুর জীবনে তিনি জিদ সম্পর্কে যে সমস্ত 'নোট্' রেখেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থ তারই সংগ্রহ। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত 'নোট্'-এর অধিকাংশই জিদ নিজে পড়ে অনুমোদন করেছিলেন। এদের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা, চলতি অর্থে, মহত্ত্বসূচক বা গুণব্যঞ্জক নয়। জিদের লেখকসুলভ দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা, বিরক্তিকর খেয়ালিপনা ও একগুঁয়েমি প্রভৃতির পরিচয়ও আলোচ্য বইয়ে পাওয়া যাবে। আর জিদ-চরিত্রের এই আপাত-নিন্দাযোগ্য দিকটি চিত্রিত করেছেন বলেই জিদের চরিত্র-চিত্র স্পর্শসহ সামগ্রিকতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

রজারের কৃতিত্ব এইখানেই। তিনি লোককে যেমন চিনতে পারেন, তেমনি চেনাতে পারেন অন্যকে। দোষে-গুণে মিশ্রিত একটা গোটা মানুষকে তুলে ধরতে পারেন পাঠকের সামনে। সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই। নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে অখণ্ডতা বা সামগ্রিকতা না থাকলে বা নিজের ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণতা না থাকলে কখনো অন্যকে পূর্ণায়ত পরিচিতিতে চিত্রিত করা যায় না। এ কাজ রজারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কারণ—তাঁর '*Notes . .*' এর ইংরেজি অনুবাদক জন রাসেলের ভাষায় বলতে হয়—তিনি নিজেই 'a whole man—whole in his outlook, whole in his interests, whole in himself.'

লেখক হিসাবে রজারের সাফল্য, বলা যায় প্রায় অসাধারণ সাফল্য, তিনি সংকীর্ণ

পরিসরে স্বল্প রেখায় অত্যন্ত জীবন্তভাবে আঁদ্রে জিদের ছবি এঁকেছেন। বড় ক্যানভাস, মেলা রং, দামি তুলি—বহু পৃষ্ঠা, অজস্র ঘটনা, অতি-সচেতন কলম—তিনি ব্যবহার করেননি। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সম্পর্কে যে সব 'নোট্' রেখেছিলেন—সংখ্যায় অল্পই—তারই ঐতঃস্ফূর্তিক গ্রন্থনায় আলোচ্য গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। রজারের সঙ্গে জিদের সমস্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণ এতে নেই। এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার উদ্দেশ্য বইটির পশ্চাতে অনুপস্থিত। আক্ষরিক অর্থেই এটি বিক্ষিপ্ত কতকগুলি 'নোট্'-এর সংগ্রহ। কিন্তু স্মৃতি-কণার সংগ্রহ হয়েও এর শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্যের নির্দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের অদ্বিতীয় স্মৃতিকথা হয়ে উঠতে পারার একমাত্র কারণ এর রচয়িতা স্বয়ং প্রতিভাশালী সাহিত্য-স্রষ্টা, যাঁর দেখার চোখ ছিল অন্তর্ভেদী, গভীর, দূরপ্রসারী।

বিচিত্র চরিত্রের লোক আঁদ্রে জিদ। ভাববাদী, আবেগপ্রবণ, একগুঁয়ে, খামখেয়ালি। বন্ধুর চাইতে বন্ধুত্বকে মর্যাদা দিতেন বেশি, হৃদয়স্পর্শী কোন ঘটনা পড়লে বা শুনলে আবেগে মুহ্যমান হয়ে পড়তেন, যা বিশ্বাস করতেন শত যুক্তি তর্কের মুখেও তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতেন, লোক-লজ্জায় বা দুর্নামের ভয়ে কখনো নিজের বিশ্বাস বিসর্জন দিতেন না; আবার উদ্ভট পরিকল্পনা ও কাজের দ্বারা বন্ধুদের কখনও উপহাসাস্পদ কখনও বা করুণার পাত্র হতেন, লেখকসুলভ দুর্বলতা তাঁর মধ্যে কিছু কম ছিল না, বন্ধুবৎসল ছিলেন, কিন্তু একদা-অন্তরঙ্গ বহু বন্ধুকে স্বচ্ছন্দে ভুলে যাওয়ার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে আঁদ্রে জিদের মূল পরিচয় যা তা হল, তিনি সৎ সাহিত্যিক ও সম্পূর্ণ মানব—ব্যক্তি-সত্তা ও লেখক-সত্তার অবিচ্ছেদ একাত্মতায় বরেণ্য সাহিত্য-ঋত্বিক।

হুইটহেডের 'Eros of the Universe' তথা সৃষ্টিশীল Eros -এর স্বাক্ষর যাঁর রচনায় প্রজ্জ্বলন্ত সেই মহৎ সাহিত্য-প্রতিভার খেয়ালিপনা স্বভাবতঃই আকর্ষণীয়। এবং আলোচ্যমান বইতে জিদের সেই ধরনের খেয়ালিপনার গল্প রয়েছে। যেমন, ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে জিদ একাধিক ওয়েস্টকোট, পুলওভার, স্কার্ফ, গেইটার, মিটেন ইত্যাদি পরতেন, আবার ঘাম হবে ভেবে কোন এক মুহূর্তে সে সব খুলে রাখতেন; একবার পরা আবার খোলা, পরা আর খোলা এই চলত অনবরত। ছটফটে আর খুঁতখুঁতেও কম ছিলেন না। সিনেমায় গিয়ে ছবি চলার মধ্যে তিন-চারবার আসন বদলাতেন। রজার লিখছেন, একবার সিনেমায় গিয়ে জিদ তাঁর কাছ থেকে রুমাল নিয়েছিলেন, আলো নেভার পর দেখা গেল রজারের সেই রুমাল দিয়ে জিদ বনেট তৈরি করেছেন।

স্বভাবতঃই ভাববাদী ছিলেন জিদ। রজারের ধারণা, জিদের কম্যুনিস্ট মতবাদ গ্রহণের পশ্চাতে ছিল তাঁর ভাববাদী ও স্বপ্নবিলাসী মন। এবং কিছুটা চঞ্চলমতিত্ব। এ প্রসঙ্গে রজারের ১৯৩৭ সালের 'নোট্স্' থেকে উদ্ধারণযোগ্য অংশ :

His adventures into politics gives proof of his courage, and of his natural generosity: but, also, of his frivolity . . . It was not political conviction that led him to Communism, but the hope and fervour *of the evangelist.* And it is as a disappointed evangelist that he turned away from it (p. 80-81).

জিদের চরিত্র-বিশ্লেষণ ও জিদ সম্পর্কিত এই ধরনের স্পষ্ট ভাষণের প্রমাণ রজার তাঁর বইয়ে আরো কয়েক জায়গায় দিয়েছেন। জিদের বিরুদ্ধে একদা-ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পরিত্যাগ বিষয়ক অভিযোগ খণ্ডন করে রজার যা বলেছেন, তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়।

শুধু জিদ-চরিত্র বা জিদ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য নয়, সাহিত্যকৃতি হিসাবেও বইটি আকর্ষণীয়। প্রেরণার কোন চূড়া হৃদয়ের কোন স্তর স্পর্শ করলে শিল্প সাহিত্য অনির্বচনীয়ের সৌরভ বিচ্ছুরিত করে, উদ্ধৃতাংশের শেষ দুটি পংক্তি তার প্রমাণ :

Paris : Monday, February 19th, 1951.

It was exactly twenty past ten o'clock in the evening.

Since yesterday, I had not seen his eyelids open.

Not grief: a quite sadness, rather.

The calm of his ending was salutary: his renunciation, his examplary submission to the laws of Nature—these things are infectious.

We must be infinitely grateful to him for having known how to die so very *well*.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ছোট্ট ছেলেটি তার বোনকে বলছে :
"দেখ্, আমরা যদি মা'র বিছানা থেকে ডানলপিলোটা সরিয়ে ফেলতে পারি, তাহলেই মা আমাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকবেন, আরো একটা গল্প শোনা যাবে। আসলে ঐ ডানলপিলোটার লোভেই তো মা রোজ রাত্তিরে অত তাড়াতাড়ি শুতে যান!"

ডানলপিলো

গৃহসুখ শতগুণে বাড়িয়ে দেয়।

DPC-97 BEN